আলোরপথ
১০ম সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, ১০ রজব ১৪৪৬ হিজরি

কেন আমি নবী মুহাম্মাদ সা. কে ভালোবাসি?

ইসলাম অনুপ্রাণিত সামাজিক কর্মকাণ্ড : সার্বজনীন কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ইহুদি ও খৃষ্টানদের কাছে দাওয়াতী কাজের নববি পদ্ধতি

আলোরপথ

১০ম সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
১০ রজব ১৪৪৬ হিজরি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
মোসলেহ ফারাদী
নুরুল মতিন চৌধুরী
মোসাদ্দেক আহমেদ
ড. দিলদার হোসেন চৌধুরী

সম্পাদক
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা সহযোগী
সৈয়দ তোফায়েল হোসেন
মোস্তাকিম প্রামানিক
আবু ইহসান
মুজাম্মেল হোসেন তুহিন
ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান
ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা
ড. মুহাম্মদ এহসানুল হক
মুহাম্মাদ মোস্তফা জামিল

পাবলিকেশন্স সহযোগী
জামিল মাহমুদ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
কনসেপ্ট ডিজাইন
conceptdesign1971@gmail.com

প্রকাশকাল
জানুয়ারি : ২০২৫

প্রকাশনায়
MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org

সূচিপত্র

কেন আমি নবী মুহাম্মাদ সা. কে ভালোবাসি? — ৪
ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ

ইসলাম অনুপ্রাণিত সামাজিক কর্মকাণ্ড : সার্বজনীন কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি — ৯
মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

ইহুদি ও খৃষ্টানদের কাছে দাওয়াতী কাজের নববি পদ্ধতি — ২২
মোসলেহ ফারাদী

কবির লাইফস্টাইল ও আদর্শিক কমিটমেন্ট — ২৫
প্রফেসর ড. এ.কে.এম আব্দুল কাদের

শীতকাল বহুমুখী নেক আমলের সুবর্ণ সুযোগ — ২৭
আব্দুল কাইয়ুম

অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আচরণ — ২৮
আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ্

সংগঠন সংবাদ — ৩২

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি, আমাদের মালিক, আমাদের রব আল্লাহ তাআলার নিকট, যিনি আমাদেরকে আলোর পথ ম্যাগাজিনের ১০ম সংখ্যা প্রকাশ করার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত, রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ!

আলোরপথ দেখতে দেখতে ১০ম সংখ্যায় এসে উপনীত হয়েছে। আপনাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা আলোরপথ-এর পথচলাকে করেছে দুর্বার। আশা করছি আগামী দিনেও আপনাদের ভালোবাসা অব্যাহত থাকবে। আলোরপথ হবে ইউরোপের মাটিতে ইসলামি পুর্নজাগরণের হাতিয়ার।

ইউরোপে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করার জন্য দাওয়াতি কাজের বিকল্প কিছু নেই। আমরা যত বেশি দাওয়াতি কাজে পেরেশানি হতে পারব তত বেশি মানুষের কাছে চির সত্যের বাণী পৌঁছাতে পারব। একই সাথে আমাদেরকে দাওয়াতি কাজে সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বন করা কুরআনের দাবি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ডাকো সর্বোত্তম পন্থায়।' অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আর তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষদের আল্লাহর পথে আহ্বান জানায়।' সুতরাং আমাদের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর পথে দায়ী হওয়া।

আমাদেরকে দ্বীনের দায়ী হওয়ার পাশাপাশি একজন সমাজ সচেতন মানুষ হওয়া জরুরি। কেননা সমাজ যদি বিপথে চলে যায় সে সমাজে ভালো মানুষ তথা দ্বীনের দায়ী থাকা না থাকা কিছু আসে যায় না। একজন মুমিন সর্বদা তার চারপাশ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। এই জ্ঞাত থাকার অর্থ হচ্ছে সে তার সমাজকে তার আদর্শের আলোকে গঠন করবে। সে যা চিন্তা করে সে চিন্তার প্রয়োগ ঘটাবে সে সমাজে।

এই লক্ষ্যে সেখানে তার আদর্শের দাওয়াত প্রচারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুত করবে। ইসলামি আদর্শের কেন্দ্র হবে মসজিদ। আমরা যাকে ইসলামিক সেন্টার বলে থাকি। এই সেন্টারে গড়ে উঠবে আধুনিক সকল দাবিকে সামনে রেখে। এখানে আদর্শের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে গবেষণা সেন্টার থাকবে। আগামী প্রজন্মকে ইসলামি ভার্বাদর্শে গড়ে তোলার জন্য থাকবে অত্যাধুনিক ও অনুপম ব্যবস্থা।

আলোর পথে লেখা দিয়ে, মূল্যবান সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে যারা আমাদের পাশে আছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি, এই সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে। ইসলামের সুমহান বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগে আমাদের অংশগ্রহণ আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

কেন আমি নবী মুহাম্মাদ সা. কে ভালোবাসি?

ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ

ভালোবাসা হলো কারো প্রতি নিরন্তর মায়া ও ভালোলাগার তীব্র ও প্রকট অনুভূতি। ভালোবাসা হলো কাউকে পাওয়ার জন্য কিংবা কারো প্রশংসা করার জন্য এক ধরনের আন্তরিক আবেগ। কিংবা ভালোবাসা হলো এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে আমরা সুখ খুঁজে পাই বা সুখ খুঁজে বেড়াই। আমরা সাধারণত তাদেরই প্রেমে পড়ি যারা আমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করে, ভালো কিছু হতে সাহায্য করে এবং সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

এলিজাবেথ গিলবার্ট বলেছেন,

'লোকেরা মনে করেন আত্মার সঙ্গী ব্যাপারটাই যথাযথ ও নিখুঁত আর সবাই তার জীবনে এমনই একজন সঙ্গী চায়। কিন্তু একজন সত্যিকারের আত্মার সঙ্গী হলো এমন একটি আয়না, যে আপনাকে সব কিছু দেখায় এবং আপনাকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখে, কিংবা সে ব্যক্তি যে আপনার ওপর আপনার মনোযোগ বৃদ্ধি করে দেয় যাতে আপনার জীবন পরিবর্তন করতে পারেন।'

নবী মুহাম্মাদ সা. তেমনি একজন, যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, যার চিন্তা আমাকে সুখী করে, যার জীবন আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, যিনি আমার জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যেন আমি আমার জীবনকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল করার উদ্দেশ্যে ইতিবাচক পন্থায় পরিবর্তন করতে পারি। তিনি আমার হৃদয়, তিনি আমার চোখ, তিনি আমার চিন্তা, এবং তিনি আমার জীবন গঠন. আমার রবের পর তিনিই সেই সত্ত্বা- যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

আমি আন্তরিকভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে আমার ভালবাসা সর্বকালের সবচেয়ে মহৎ এই মানুষটির জন্য নিবেদিত। মানব ইতিহাস অনেক মহান নেতা তৈরি করেছে যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের চিহ্ন রেখে গেছে। এদের মধ্যে আছেন দার্শনিক, পন্ডিত, ধার্মিক সাধক, বিজয়ী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, উদ্ভাবক, আইনজ্ঞ, প্রকৌশলী এবং ডাক্তার। তারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভালো করার জন্য মানব ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু আমার প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ সা. জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক চিহ্ন রেখে গেছেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রোলমডেল হিসেবে ধ্রুতারার মত উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। তাই তিনি সবার কাছে প্রিয় এবং সম্মানিত হয়ে উঠেছেন, এমনকি যারা ইসলাম অনুসরণ করে না, তাদের কাছেও তিনি একজন গ্রহণযোগ্য ও রোলমডেল হিসেবে বিবেচিত হন।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের

অনন্য, এবং অনবদ্য সব বৈশিষ্ট্য তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। উইলিয়াম ড্রেপার তার হিস্ট্রি অব ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অব ইউরোপ' (ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ইতিহাস) শীর্ষক বইতে বলেছেন, 'জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন।' একইভাবে, লামার্টিন তার হিস্টোরি ডে লা তুর্কী নামের বইতে কলেন, দার্শনিক, বক্তা, আইন প্রণেতা, চিন্তক, যুক্তিভিত্তিক ধর্মীয় মতবাদের পুনরুদ্ধারকারী একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত মুহাম্মাদ সা.। যে মানদন্ডগুলোর বিচারে আমরা একজন মানুষকে মহামানব মনে করি, এর সবগুলোই নবী মুহাম্মাদ সা. এর মাঝে ছিল। এসব মানদন্ডে তাঁর ওপরে কেউ নেই।

আমি এই নিবন্ধটি উৎসর্গ করতে চাই আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে। আমি কেন হজরত মুহাম্মদ সা. কে ভালবাসি এবং কেন অন্য সবার চেয়ে তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা উচিত এবং কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো যায়- এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি কিছু মতামত উপস্থাপন করছি। আমি নবীজি সা. কে কেন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, এর নেপথ্যে ৭টি চমৎকার কারণ সনাক্ত করা যায়:

১. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন :
আমি আল্লাহর নৈকট্য পেতে চাই যাতে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভালবাসা ও করুণা পেতে পারি। প্রখ্যাত সাহাবী হজরত আনাস রা. এর একটি বর্ননা থেকে জানা যায়, "যদি পৃথিবীতে এমন কোনো পরিস্থিতি আসে যখন মুসলমানেরা সাহাবী ও নেককার পূর্বসূরিদের মতো করে নেক আমল করতে পারছেন না, তাহলে তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক ঘোষণা হলো, শুধুমাত্র আল্লাহর রসূল সা.-কে ভালবাসার মাধ্যমে, তারা কেয়ামতের দিন নবীজি সা. এর নৈকট্য নিশ্চিত করতে পারেন।

আনাস রা. হাদিসটিতে বর্ণনা করেন যে. "একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিয়ামত (অর্থাৎ বিচারের দিন) সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামত কখন হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এর জন্য কি এমন প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বলল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। এ ছাড়া আমার আর বলার মতো তেমন কোনো আমল নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের সাথে থাকবে যাদের তুমি ভালোবাসো। নবীজি সা. এর উক্তিটি শুনে আমরা যতটা খুশি হয়েছিলাম আর কোনো কথায় এতটা খুশি হইনি। এ কারণে আমি নবীজি সা., আবুবকর এবং উমর রা.-কে ভালবাসি এবং আমি আশা করি যে এ ভালোবাসার কারণে আমি তাদের সাথে থাকতে পারবো। যদিও আমার কাজ বা আমল তাদের মতো উন্নত নয়। (সহীহ আল বুখারী)

আল্লাহর রাসূল সা. এর প্রতি ভালোবাসার একটি শক্তিশালী নিদর্শন পাওয়া যায় রাসূল সা. এর আনুগত্য করার মধ্য দিয়ে। যেমনটা ইমাম শাফেঈ রহ. বলতেন:

"যদি আপনার ভালবাসা আন্তরিক হয়, তাহলে আপনি অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতেন।
কারণ মানুষ প্রকৃতপক্ষে যাকে ভালোবাসে, তারই আনুগত্য করে।"

২. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা :
রাসূল সা. এর পদাংক অনুসরণ করে আমরা কেবলমাত্র রাসূল সা. এর প্রতি আমাদের ভালোবাসার বহি:প্রকাশ ঘটাই না বরং একই সাথে আল্লাজর ভালোবাসা অর্জনেও সক্ষম হই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

"(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সুরা ইমরান: ৩১)

৩. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল সা. এর আনুগত্য করার অর্থই হলো প্রকারান্তরে আল্লাহর আনুগত্য করা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

"যে লোক রসূলের (স.) হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক রসূলের (স.) আনুগত্যের বরখেলাফ করলো, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের

জন্য জিম্মাদার নিযুক্ত করে পাঠাইনি।” (সুরা নিসা: ৮০)

৪. ঈমান পরিপূর্ণ করা :

একজন মুসলিমের ঈমান কখনোই পরিপূর্ণতা পাবে না, যদি না সে রাসূল সা. কে ভালোবাসে। আর রাসূল সা. এর প্রতি তার ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পাবেনা যদি নিজের পিতা, নিজের সন্তান. তার নিজের এবং অন্য সবার প্রতি ভালোবাসার চেয়ে প্রকট ও তীব্রতর না হয়।

মহান আল্লাহ বলেন

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

“বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্নীয় স্বজন তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা মন্দা হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর সেগুলো যদি আল্লাহ, রসূল (স.) ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” (সুরা তাওবাহ: ২৪)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হই। (মুসলিম ১/১৬ হাঃ ৪৪, আহমাদ ১২৮১৪)

আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম রা. থেকে বর্ণিত যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম যখন তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর হাত ধরে ছিলেন। উমর রা. তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল(স.) আপনি আমার কাছে আমার নিজের নফস ব্যতীত সবকিছুর চেয়ে প্রিয়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ “না, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে তোমাদের নিজের থেকেও প্রিয় না হব। উমর রা. তাকে বললেনঃ এখন আল্লাহর কসম, আপনি আমার কাছে আমার নিজের চেয়েও প্রিয়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ “এখন আপনি সত্যিকারের ঈমানদার হলেন, হে উমর। (বুখারি: ৬২৫৭)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: যে কারণে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসা এবং তাঁর প্রশংসা ও সম্মান করা অন্য যে কোনো ব্যক্তির প্রশংসার চেয়ে বেশি অপরিহার্য তা হল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর ঈমান আনা ও অনুসরণ করা ছাড়া এবং তাঁর সুপারিশ ছাড়া দুনিয়া বা আখিরাতে সর্বোচ্চ কল্যাণ কখনোই অর্জন করতে পারবো না। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া কিংবা আল্লাহর নেয়ামতে সিক্ত হওয়া- দুটোর কোনোটাই রাসূল সা. এর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর অনুগত থাকা কিংবা তাঁকে অনুসরণ করা ছাড়া সম্ভবই নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি ও লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার এটিই একমাত্র উপায়।

মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত হলো ঈমানের নেয়ামত, যা কেবল রাসূল সা. এর মাধ্যমেই লাভ করা যায় এবং যা তার নিজের নফস ও সম্পদের চেয়েও অনেকবেশি কল্যাণকর। রাসূল সা. হলেন সেই ব্যক্তি যার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। রাসূল সা. এর দেখানো পথ ছাড়া আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর অন্য কোনো পথ নেই। কেননা, রাসূল সা. এর প্রতি দরদী ও অনুগত না হলে ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবার কোনোটাই আল্লাহর সামনে তার জন্য কোনো কাজে আসবে না।চ (মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৭/২৪৬।)

এ কারণে, আমি আমার ঈমান পরিপূর্ণ করার জন্য হজরত মুহাম্মাদ সা. কে ভালবাসি, যাতে এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

৫. তিনি আল্লাহর পর আমাকে/আমাদেরকে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাই আমিও তাকে ভালোবাসি।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে রাসূল সা. এর অসাধারণ, চমৎকার ও বিশুদ্ধ চরিত্র সম্পর্কে বর্ননা করতে গিয়ে ইরশাদ করা হয়েছে

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (সুরা তাওবাহ: ১২৮)

তিনি আমাকে, আমাদেরকে, সকল মুসলিমকে ভালোবাসেন। তাই মুসলিম হিসেবে আমাদেরও দায়বদ্ধতা হলো অন্তরের

অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ভালোবাসা।
আনাস বিন মালিক রা. বর্নিত। রাসূল সা. বলেছেন,
وددتُ أنّي لقيتُ إخواني قالَ : فقالَ أصحابُ النَّبيِّ – صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ – أوليسَ نحنُ إخوانَكَ قالَ : بل أنتُم أصحابي ولكنْ إخواني الَّذينَ آمَنوا بي ولم يرَوني
'আমি যদি আমার ভাইদের সাথে দেখা করতে পারি।' সাহাবীগণ বললেন, আমরা কি তোমাদের ভাই নই? নবীজি বললেন, 'তোমরা আমার সাথী, কিন্তু আমার ভাই তারা যারা আমাকে না দেখেও আমাকে বিশ্বাস করবে এবং আমার ওপর ঈমান আনবে।' (আহমাদ)
৬. তাঁর জীবন ও দিক নির্দেশনা আমাকে আলোকিত জীবনে যাওয়ার আলো প্রদান করে:
আমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়ার জন্যই, মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আমার জীবনকে আলোকিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ সা. কে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ٤٦

হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী হিসেবে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সুরা আহযাব: ৪৫-৪৬)
আল্লাহ পাক আরো বলেন,
إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٨ لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٩

"আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্যেও সাক্ষ্য দাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে। যাতে তোমরা (ঈমানদারেরা) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।" (সুরা ফাতহ: ৮-৯)
এ কারণে নিজের জীবনকে আলোকিত রাখার জন্য এবং সঠিক পথের ওপর থাকার জন্য আমি নবী মুহাম্মাদ সা. কে আমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে রোল মডেল হিসেবে রাখতে চাই। আমাদের সবারই এমনটাই করা উচিত।

৭. উদ্দীপনা ও শক্তি পাওয়ার জন্য :
আমি বিশ্বাস করি যে রাসুল সা. এর এর ভালবাসা বিদ্যমান পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও বস্তুবাদের প্রভাব এবং শয়তানের অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ঢাল। রাসূল সা. এর প্রতি ভালবাসা এমন উৎসাহ শক্তি জোগায় যা আমাকে এবং সকল নিবেদিত মুমিনকে সরল পথে চালিত করে। রাসূল সা. এর প্রতি ভালোবাসা আমাদেরকে সমাজের কুপ্রভাব, অহংকার প্রতারণা এবং শয়ানের ফাঁদ থেকে রক্ষা করে।

আল্লামা ইকবাল ইসলামের প্রতি তার যাবতীয় আসক্তি ও ভালোবাসাকে নবীজি সা. এর প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন: "চোখ ধাঁধানো পশ্চিমা বিশ্ব আমাকে মোটেও মুগ্ধ করেনি, যতটা না মদীনার ধুলোবালি করেছে। আমার চোখদুটো মদীনার ধুলোয় সমৃদ্ধ।"

কিভাবে নবী মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি একটি অর্থপূর্ন এবং ফলপ্রসু মহব্বত গড়ে তোলা যায়?

১.তাঁর সম্পর্কে জানা: নবীজি সা. এর জীবন থেকে সামগ্রিক উপকারিতা ও নেয়ামত পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর জীবনের আদ্যপান্ত জানতে হবে।
২.তাঁকে রোলমডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে: আমাদেরকে অবশ্যই নবীজি সা. কে জীবনের রোলমডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرً

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর (স.) জীবনের মাঝেই উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে।
৩.তাঁর সুন্নাহ আনুসরন করা

وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ
রাসুল (স.) বলেন, যে ব্যাক্তি আমার সুন্নাহকে মহব্বত করে সে আমাকে মহব্বত কওে, যে আমাকে মহব্বত করে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে(তিরমিযি-২৬৭৮)
৪.রোলমডেল হিসেবে তাকে অনুসরণ করা এবং সে আলোকেই চরিত্র গঠন
তাঁর সুন্নাহ সাফল্যের মাপকাঠি, তাঁর চরিত্র আমাদের জীবনের আলো। অতএব, তাঁর জীবন থেকে অবিচ্ছিন্ন আলো পেতে

আমাদের অবশ্যই তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁকে আদর্শের

৫.নিয়মিত দুরুদ পাঠ করুন:

নবী মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি দুরুদ ও সালাম পেশ করা কেবল তাঁর প্রতি ভালবাসার চিহ্নই নয়, বরং এটি সর্বশ্রেষ্ঠ একটি ইবাদত। এটি ইহকাল ও পরকালে আমাদের জন্য সবচেয়ে উপকারী আমলগুলোর একটি। নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান লালন করার যে দায়বদ্ধতা কিংবা আমাদের প্রতি তাঁর যে হক তা আদায়ের অন্যতম মাধ্যম হলো এই দুরুদ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সা. এর প্রতি দুরুদ প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন,

"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে সালাম ও সালাওয়াত প্রেরণ কর।" (সুরা আহযাব: ৫৬)

আমাদের প্রিয় নবী সা. নিজেই বলেছেনঃ

কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ তারাই হবে যারা আমার প্রতি বেশি বেশি সালাম পাঠাবে। (তিরমিজি)

তাই নবী সা. -এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা থেকে উত্তমভাবে লাভের জন্য আমাদের অবশ্যই নিয়মিত তাঁর প্রতি সালাম পাঠাতে হবে।

উপসংহার :

পরিশেষে, আমি একটি খুবই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা উপস্থাপন করতে চাই যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের রাসূল সা. আমাদের প্রতি কী আশ্চর্যরকম দরদ ও ভালোবাসা লালন করতেন। আমাদের প্রিয় নবী সা. আল-বাকী কবরস্থানে যেতেন এবং ইতোপূর্বে গত হওয়া সাহাবীদের কবর জিয়ারত করতেন। এরকম জিয়ারতের সময় একবার নবীজি সা. বললেন,

"আমি যদি আমার ভাইদের সাথে দেখা করতে পারতামচ

সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সা. এর এই বক্তব্য শুনে অবাক হয়েছিলেন, বিশেষ করে যেহেতু কথাটি কবরস্থানে বলা হয়েছিল। তাই নবীজি সা. 'ভাইদের' শব্দটি দিয়ে কাদের বুঝিয়েছেন তা তারা স্পষ্ট করে বুঝতে পারেননি। নবীজি সা. কী ইতোমধ্যে যারা মারা গিয়েছেন তাদের কথা বলছেন নাকি যারা এই প্রজন্মের কিন্তু পরে মারা যাবে- তাও তারা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। অতঃপর তারা নবী সা. সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল সা. আমরা কি আপনার ভাই নই?

রাসূল সা. বললেন, "না, তোমরা আমার সাথী। আমি আমার সেই ভাইদের কথা বলছি যারা আমাকে না দেখেও আমাকে বিশ্বাস করবে, আমার ওপর ঈমান আনবে, আমাকে অনুসরণ করবে।

কতই না আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রিয়নবী সা. আমাদের না দেখেও আমাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আপনি কি তাহলে কল্পনা করতে পারেন যে, আমাদের প্রতি তার অনুভূতি এবং ভালবাসা কতটা গভীর ছিল?

আমি তাঁর (সাঃ) সাথে সাক্ষাতের জন্য, তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমাদের সকলেরই এই আগ্রহ থাকা উচিত। কিন্তু কিভাবে আমরা তাঁর (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করতে পারি?

নবী (সাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন যে দুটি উপাদান রয়েছে যা আমাদেরকে পরকালে তাঁর সাক্ষাত পাওয়ার সুযোগ করে দেবে।

প্রথমটি হল ঈমানের বিশুদ্ধতা (ইমান) এবং দ্বিতীয়টি হল উত্তম চরিত্র, (যেমন: নবীজি সা. এর মতো চরিত্র)।

তাই আমাদের ঈমানকে সকল প্রকার শিরক থেকে শুদ্ধ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজি সা. এর আচরণবিধি অনুসরণ করে আমাদের চরিত্রকে একটি অসাধারণ চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এতে করে আমরা সারাজীবন তাকে স্মরণ করতে পারব এবং তার সাথে দেখা করার অপেক্ষায় থাকব, এবং নিজেদেরকে সে জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর পদাঙ্ক জানা, বোঝা ও অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমাদের অন্তরকে সবসময় তাঁকে স্মরণ ও মহব্বত করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে নবীজি সা. এর প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়ে দিন এবং এই ভালোবাসাকে এমন একটি চালিকা শক্তিতে পরিণত করুন যাতে আমরা জান্নাতে নবীজি সা. এর সাক্ষাত পাওয়ার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে পারি। আমিন। সুম্মা আমিন। হে আল্লাহ, দয়া করে আমাদের প্রিয় নবী সা. এর প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। আমিন।

লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)

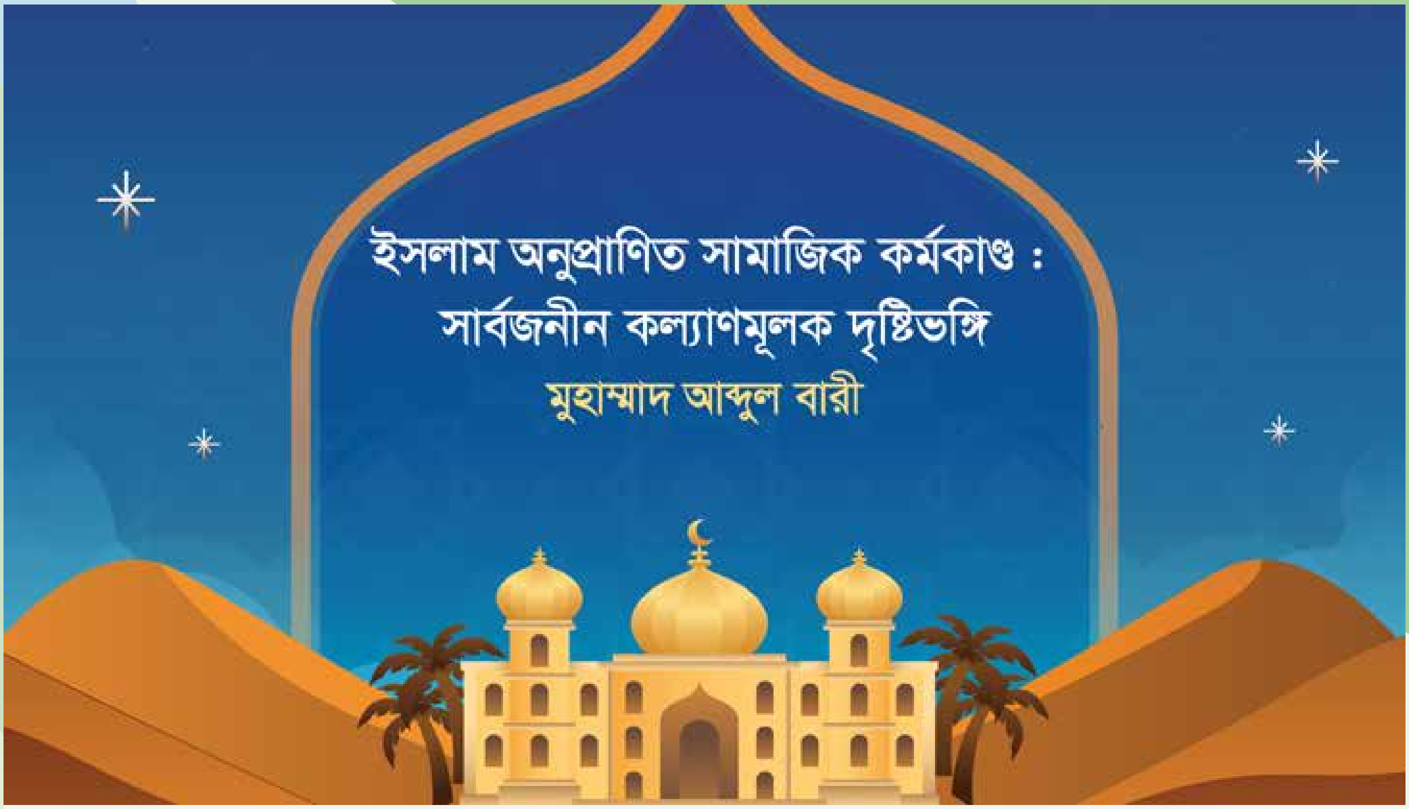

সারাংশ

কোন বিষয়টি আসলে মানুষকে সামাজিকভাবে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে? ব্যক্তিগত চাহিদাপূরণ নাকি উচ্চাকাঙ্ক্ষা? জাতীয়তাবাদ, আদর্শ নাকি ধর্ম? এ প্রশ্নটি সব যুগেই মানুষের মাঝে ঘুরপাক খেয়েছে।

এই নিবন্ধটি প্রথম লেখা হয়েছিল ২০১১ সালে; এরপর ২০১৩ সালে এর পরিধি কিছুটা বাড়ানো হয়। এই লেখাটি মূলত পশ্চিমে কর্মরত বেশ কিছু ইসলামি গ্রুপের একটি নির্মোহ পর্যালোচনা যার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য কিছু ভাবনা প্রদান করা। এটি মূলত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক শুরুর একটি প্রয়াস যাতে করে মুসলিম সম্প্রদায় এমন কিছু উন্নত মানুষের অবদানে সমৃদ্ধ হতে পারে যারা একটি বহুমাত্রিক সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। এই মুহূর্তে আমরা এমন একটি সময়ে অবস্থান করছি, যখন মুসলিম প্রতিটি গ্রুপেরই উচিত নিজেদের কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো যাচাই করা। তারা নতুন প্রজন্মকে একটি সার্বজনীন ও ইসলামের অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শনের আওতায় কতটা গড়ে তুলতে পারবেন এর ওপরই তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্ভর করছে। এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে পারলে সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলো উজ্জীবিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে যার মাধ্যমে তারা ইসলামের প্রকৃত বার্তা ও চেতনা অনুশীলনের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

ভূমিকা :

মুসলিমরা ইউরোপে নতুন কেউ নয়; ইসলামও এখানে বাহির থেকে উড়ে আসা কোনো ধর্ম নয়; যদিও অনেক মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক তেমনটাই মনে করেন। ইসলামের প্রথম হিজরি থেকে যাত্রা শুরু করে ইউরোপে মুসলিমদের যে অগ্রযাত্রার বৃত্তান্ত– তা সত্যিই আকর্ষণীয়। যুক্তরাজ্যে, মার্সিয়ার রাজা ওফা ৮ম শতাব্দিতে ইসলামের কালিমা সম্বলিত একটি মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। মানবতা, সৃজনশীলতা, ইতিবাচক উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা পরিচালনার সক্ষমতা– সবটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত; যা শিক্ষক হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষের সামনে আরবেরা উপস্থাপন করেছে। আবরাহামিক এই মূল্যবোধগুলো কালানুক্রমে ইউরোপ গ্রহণ করে নেয় যা পরবর্তীতে রেনেসাঁ, সংস্কার এবং এনলাইটমেন্টের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। সে সময়ের মুসলিমরা ছিলেন বলিষ্ঠ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন– অপরের থেকে শেখার আগ্রহ তাদের ছিল এবং তারা যা বিশ্বাস করতেন সে আলোকে কাজ করতেও তারা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমা জগতে মুসলিম সম্প্রদায় বহুভাবে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে গিয়েছেন এবং এ বিষয়ে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ

একাডেমিক গবেষণা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ইসলামি গ্রুপের নেতৃবৃন্দ কীভাবে তাদের আশা, নানা ধরনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সাথে বাস্তবতার সমন্বয় করেছেন এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ক্রমবর্ধমান মুসলিম সম্প্রদায়গুলো নানাবিধ চ্যালেঞ্জ যেভাবে মোকাবেলা করেছেন, এই লেখনিতে তা তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসরত অধিকাংশ মুসলিম বেশ অনগ্রসর প্রেক্ষাপট থেকে এখানে এসেছেন এবং এখানে কাজের ক্ষেত্রেও যেহেতু সমান সুযোগ সুবিধা নেই, তাই তাদের পক্ষে খাপ খাওয়ানো সত্যিই বেশ দুরূহ। এরপরও, আভ্যন্তরীণ নানা সীমাবদ্ধতা এবং বাহ্যিক নানা চ্যালেঞ্জ থাকার পরও মুসলিমরা সবসময়ই ইতিবাচক নানা প্রয়াস পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণের কথা বলা যায় যেগুলো অসংখ্য মানুষের ধর্মীয় কৌতূহল যেমন নিবারণ করেছে, একইসাথে ছোট শিশুদের কুরআন ও নিজ নিজ মাতৃভাষা শেখার সুযোগ করে দিয়েছে, যুব সম্প্রদায়ের জন্য নানা আয়োজন করেছে; যুব সংগঠন ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দুর্যোগ মোকাবেলায় দাতব্য ও তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে, মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত থ াকার চেষ্টা করেছে; উম্মাহ'র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে জীবন্ত রেখেছে এবং আন্তঃধর্মীয় কার্যক্রমের মতো প্রশংসনীয় কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে।

এই লেখাটি মূলত পশ্চিমে কর্মরত বেশ কিছু ইসলামি গ্রুপের একটি নির্মোহ পর্যালোচনা- যার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য কিছু ভাবনা প্রদান করা। এই ধরনের কোনো পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলা কাম্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের সাথে যা সঠিকভাবে হয়েছে তা ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করা; আমরা কোন কোন খাতে এখনো হোঁচট খাচ্ছি সেগুলো শনাক্ত করা এবং এসব ক্ষেত্রে আরো কীভাবে ভালো করা যায় তা নিরূপণ করা। আমাদের বৈচিত্রময় মানব সম্প্রদায়ের সক্ষমতা এবং সামাজিক কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য যারা কাজ করছেন এমন কোনো গ্রুপকে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়; তবে আমার উদ্দেশ্য হলো এগুলো বিশ্লেষণ করা যাতে এই কার্যক্রমগুলোর গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং তারা যেন বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে ওঠে কাজগুলো করতে পারেন। এই লেখাটি একটি ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ যার মূল উদ্দেশ্য হলো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নতুন করে বিতর্ক ও আলাপ আলোচনার সূত্রপাত করা যাতে করে মুসলিম সম্প্রদায় আরো সমন্বিতপন্থায় এমন কিছু উন্নত মানুষের অবদানে সমৃদ্ধ হতে পারে যারা একটি বহুমাত্রিক সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। এই পর্যালোচনাটি এমন একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা হয়েছে যিনি এই বৈচিত্রময় সমাজ কাঠামোতে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন এবং এর প্রেক্ষিতে বিদ্যমান ব্যবস্থায় বড়ো ধরনের একটি আলোড়নের জন্য অপেক্ষা করছেন। এটি নিছক কোনো একাডেমিক বা ফিকাহ সংক্রান্ত নিবন্ধ নয়। আমি নিশ্চিত, স্কলার এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে আরো ভালো কিছু করতে সক্ষম হবেন।

কারো কারো মনে হতে পারে যে, সম্পদের নিদারুণ স্বল্পতা ও চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির ভেতর থেকেও যে গ্রুপগুলো তাদের দিক থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আমি হয়তো তাদের ব্যাপারে একটু নির্দয়ভাবেই সমালোচনা করেছি। আবার কারো এমনও মনে হতে পারে যে, আমি হয়তো কিছু বিষয় এড়িয়ে গিয়েছি এবং যতটা সমালোচনা করা উচিত ছিল ততটা করিনি। প্রকৃতপক্ষে, আমার অভিপ্রায় হলো মুসলমানদের সামাজিক কার্যক্রম ও সম্পৃক্ততার বিষয়ে একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার সূত্রপাত করা যাতে করে আমাদের বিদ্যমান সমাজ কাঠামোকে আরো উন্নত করতে পারি। আমি তাই বিনয়ের সাথে সবাইকে অনুরোধ করছি, আপনারা দয়া করে ভাষা ও বাক্যশৈলীর তুলনায় এই লেখনির নেপথ্য উদ্দেশ্যকে বেশি গুরুত্ব দেবেন।

সবার আগে, আমি সংক্ষেপে প্রাক-ঔপনিবেশিক সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের মুসলিম উম্মাহ'র ঐতিহাসিক কিছু বাস্তবতা তুলে ধরবো যা আমাদের জন্য ভীষণই প্রাসঙ্গিক হবে কেননা পশ্চিমে বসবাসরত মুসলিমেরা এই অতীতের ধারাবাহিকতাই বহন করে।

ঐতিহাসিক অনাচার ও মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া :

গত কয়েক শতাব্দী ধরেই বিশেষ করে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় এবং পরবর্তীতেও মুসলিম উম্মাহর অবস্থার সত্যিকারার্থেই যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। এই সময়ের ভেতর, উম্মাহ ধীরে ধীরে বৈশ্বিক বিষয়াবলীতে নিজেদের অবস্থান ক্রমাগত হারিয়েছে এবং নিজেদের মান-মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রেও অন্যকে নাক গলানোর সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক

আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এই মর্মে অভিমত দিয়েছেন যে, গোটা উম্মাহ আসলে দুনিয়া (এই পৃথিবী) এবং আখিরাতের (পরকাল) মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। আর দুনিয়া হারিয়ে গেলে আখিরাতও হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই ভালো জানেন, তবে এটি তাঁরই প্রতিশ্রুতি যে, আখিরাতে সফলতা নির্ভর করবে দুনিয়ার কৃতকর্মের উপর।

১২৫৮ সালে বাগদাদে তাতার বাহিনীর হাতে আব্বাসীয় খিলাফতের চূড়ান্ত পতন ঘটে যাওয়ার পর নিজেদের ব্যর্থতার কারণেই, মুসলিম বিশ্ব ধীরে ধীরে তার উজ্জীবনী শক্তি ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দ্বীনের সুমহান চেতনাকে ম্লান করে দেয়। ফলে, প্রাণহীন ধর্মীয় আচারাদি এবং অতীতের অন্ধ অনুসরণই মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। অথচ এই মুসলিমরাই একটি সময়ে উজ্জ্বল এবং দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্ভুক্তিমূলক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

ক্রমাবনতিশীল এই সময়ে, উম্মাহ ধীরে ধীরে টিকটিকির গর্তে পড়তে শুরু করে (এই উপমাটি নেওয়া হয়েছে সহীহ আল বুখারি: ৭৩২০ নং হাদিস থেকে)। অন্যদিকে, মুসলিম স্কলারেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এবং শাসকের আসনে অযোগ্য ব্যক্তিরা চলে আসায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে যায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্ব, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব, নিরক্ষরতা এবং পরনির্ভরশীল ও অনুৎপাদনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বে একটি অদক্ষ মানব জনসংখ্যার জন্ম দিয়েছে যা সম্পদের পরিবর্তে বরং তাদের জন্য বোঝায় পরিণত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সমস্ত ভূখণ্ডই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অধীনে চলে গিয়েছিল। পাশাপাশি, ধর্মতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও উম্মাহ বহুধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একটি জাতিকে অভ্যন্তরীণ যেসব দুর্যোগ পতনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায় এর প্রায় সবগুলোই উম্মাহর মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। ফলে, মুসলিমরাই তাদের চরম শত্রুতে পরিণত হয়।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকে আজ অবধি মুসলিমরা সংকটের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অতিক্রম করেছে :

পশ্চাদপসরণ পর্যায় : এই পর্যায়ে উম্মাহ বিশ্ব নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গা থেকে ছিটকে পড়ে। পাশাপাশি, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামরিক ও রাজনৈতিক স্তরেও পূর্বসরীদের ভূমিকা থেকে মুসলিমরা পিছু হটে। অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির ব্যর্থতা থেকে আন্তঃসামরিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। অভ্যন্তরীণ বিভাজনের ফলে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে স্বাধীন শাসকদের (সালতানাত বা আমিরাত) উত্থান হয়। খলিফা তখন নিছকই প্রতীকী একটি ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার অধীনেই এরকম একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সর্বত্রই উম্মাহ দুর্বলরূপ ধারণ করে যার ফলে বহিঃআগ্রাসনের পথ সুগম হয়। মূলত তখন মুসলিম ভূখণ্ডে একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছিল আর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা সে সুযোগটাই নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক এসব আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে দু এক সময় কিছু বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এর বাইরে মুসলিম জনগণ মোটাদাগে তুলনামূলক নিষ্ক্রিয়ই ছিল।

ঔপনিবেশিক পর্যায় :

মুসলিম ভূখণ্ডের দুর্বল স্থানগুলোতে ঔপনিবেশিক শক্তি প্রবেশ করে। যেমন– ১৭৫৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম বাংলার পতন ঘটে এবং এরপর ধীরে ধীরে মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ফলে, মুসলিম ভূখণ্ডের বেশিরভাগ অংশেই ইউরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। যে মুসলিম দেশগুলো পুরোপুরি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে চলে যায়নি এর মধ্যে ছিল বর্তমান সৌদি আরব, ইরান, তুরস্ক এবং আফগানিস্তান। কিন্তু এ দেশগুলোও তখন অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দেশের পর দেশ বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডগুলোতে ভূমি দখল ও লুটপাট, জাতিগত নিধন এবং বিভক্তি-বিভাজন নিত্যদিনের চিত্রে পরিণত হয়। ১৯২৪ সালে তথাকথিত 'ইউরোপের অসুস্থ মানুষটির' মাধ্যমে উসমানীয় খিলাফাতের পতন হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরও নিস্তেজ হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহ তীব্র হতাশায় নিমজ্জিত হয় কারণ উম্মতের ঐক্যের সর্বশেষ প্রতীকী খেলাফতও এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উত্তর-ঔপনিবেশিক বা নব্য ঔপনিবেশিক পর্যায় :

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নামমাত্র স্বাধীনতা পেলেও, মুসলিম ভূখন্ডগুলো বিদেশী প্রভুদের মদদে ধর্মনিরপেক্ষ স্বৈরাচারী শাসকের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। একইসাথে, জাতিগত ও ভৌগলিকভাবেও মুসলিম

উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়টিকেই নব্য-ঔপনিবেশিক পর্যায় হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। মুসলিম দেশগুলির অব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ মুসলিম জনসংখ্যাকে শাসন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় সার্বিক পরিস্থিতি এখন অনেকটাই যেন জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে। নিরক্ষরতা, পরজীবী এবং পরনির্ভরশীল অর্থনীতি, রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখন মুসলিমদের সার্বিক ব্যর্থতার মূল কারণ হয়ে উঠেছে। কোল্ড ওয়ারের আগে মুসলিম বিশ্ব তৎকালীন দুই পরাশক্তির আদর্শিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল এবং ৯/১১-পরবর্তী সময়েও বেশ কিছু মুসলিম দেশকে ওয়ার অন টেরর বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের থিয়েটারে পরিণত করা হয়েছে।

আত্ম পরিচয়ের সংকট শীর্ষক পর্যায় :

আত্ম পরিচয়ের ব্যাপক সংকট এবং সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি মুসলিম বিশ্বে এবং পশ্চিমা বিশ্বে উম্মাহর প্রাণশক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে। কেননা, প্রথমত এবং সর্বাগ্রে, মুসলিমরা জ্ঞানের সাধনা এবং ঐতিহাসিক ইসলামি চেতনা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে, সামাজিক সংহতির অনুপস্থিতি এবং পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা, আশাবাদ ও দূরদৃষ্টির অভাব প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে। এরই পরিণতিতে, মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা জগতে থাকা মুসলিম সম্প্রদায়গুলো গত কয়েক দশকে বৈশ্বিক অবমাননা ও উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে।

ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপনের পাশাপাশি ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলো বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে মুসলিমদেরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন করতে চেয়েছিল। একইসাথে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দমন পীড়ন এবং প্রাচ্যবাদী কর্মকৌশলের মাধ্যমে ইসলামকে তারা শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, মুসলিম উম্মাহ এক বুক হতাশা নিয়ে খাদের শেষ প্রান্তে নিমজ্জিত হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে থেকে ইসলাম ক্রমাগত নি:শেষ হয়ে পড়ছিল। মানবতার কল্যাণের জন্য ইসলামের আগমন ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক শাসনামলের এই সময়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি কলংকজন অধ্যায় হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছে।

এরপরও, ইসলামের সহজাত শক্তির কারণে এই অন্ধকার সময়েও ইসলামি ভূখণ্ড জুড়ে বেশ কিছু ঐতিহাসিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল যা মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য একটি আশার সঞ্চার করেছিল। জনগণের স্বাধীনতা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার জন্য বিশ্বের অনেক জায়গায় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দাগেস্তানে শায়খ শামিল, লিবিয়ায় সেনুসি, সুদানে মাহদি, খিলাফত আন্দোলন ও পার্টিশন পূর্ববর্তী সময়ে পাকিস্তান আন্দোলন এবং আলজেরিয়ার এফএলএন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয়দের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুসলিম ভূখন্ডগুলোর স্বাধীনতা অর্জনে এই আন্দোলনগুলোর অবদান ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক। একই সাথে মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু অংশে বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষামূলক ও সামাজিক আন্দোলনেরও সূচনা হয়েছিল। এক্ষেত্রে জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামিক আন্দোলনের উদাহরণ দেওয়া যায়।

এই চমকপ্রদ আন্দোলনগুলোর বেশিরভাগই উলামাদের মাধ্যমে বা তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। এই উলামাদের ভেতর ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করার মতো আবেগ এবং ধর্মীয় অঙ্গীকার প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল। তারা নিজস্ব সৃজনশীল উপায়ে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান এবং ইতিবাচক বয়াণ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষ করে তরুণরা তাদের কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং উম্মাহর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক প্রয়াসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য বৈশ্বিক কারণগুলোর প্রভাবে, বিশেষ করে দুটো বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম ভূখন্ডে ঔপনিবেসিক পরাশক্তিগুলোর অবস্থান ও দখলদারিত্ব দুর্বল হতে শুরু করে। একটি পর্যায়ে ঔপনিবেসিক শাসকেরাই অনুধাবন করেন যে, তারা তাদের উপনিবেশগুলিকে সরাসরি শাসন করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। এমতাবস্থায়, উপনিবেশকারীরা প্রক্সি কারো হাতে শাসনভার দিয়ে এসব এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পথ খুঁজছিল। চলে যাওয়ার আগে তারা সর্বত্র তাদের ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি প্রয়োগ করে এবং বিভাজিত মুসলিম ভূখন্ডগুলো তাদেরই বুদ্ধিবৃত্তিক দোসরদের হাতে তুলে দেয়। এক্ষেত্রে এমন সব লোকদের বাছাই করা হয়েছিল যাদের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবেই তারা জানতো যে, এই শাসকেরা নিজেদের দেশের জনগনের পরিবর্তে বরং তাদের ঔপনিবেসিক প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা অর্জনের পরও অধিকাংশ মুসলিম দেশে ঠিক এমনটাই ঘটেছে।

বিংশ শতকের মাঝামাঝি মুসলিম ভূখন্ডগুলোর অধিকাংশই দৃশ্যমানভাবে স্বাধীন হয়ে যায় কিন্তু রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিকভাবে তখনও এই এলাকাগুলো পশ্চিমা শক্তির অধীনেই ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ইউরোপীয়দের কাছ থেকে নব্য-ঔপনিবেশিক শাসনের চাবিটা নিয়ে নিয়ে। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে যেসব আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তারা আবার প্রান্তিকতার সীমাবদ্ধতায় আঁটকে যায়। ফলত, মুসলিম ভূখন্ডগুলো বাদামী চামড়ার শাসকদের হাতে চলে যায়। এসব শাসকদের কেউ কেউ তাদের জনগণকে গোত্র প্রধান বা সামরিক স্বৈরশাসকের মতো করে শাসন করে। উম্মাহর শক্তি ও সম্ভাবনা ততদিনে এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল যে মুসলমানরা নিজেদেরকে আর মর্যাদাবান জাতি হিসেবে গড়েই তুলতে পারেনি।

এই পর্যায়ে আরেকটি ঘটনাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামি আন্দোলনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের জন্য এ ঘটনাটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে নবুওয়াতের (আলা মিনহাজ আন-নুবুওয়াত) মডেলে একটি 'খিলাফাহ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুন্নি বিশ্বে দুজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে দুটি আন্দোলনের সূচনা হয়। এই দুটো আন্দোলনের একটি হলো ইখওয়ানুল মুসলিমিন, যা শুরু হয়েছিল মিশরে এবং সাধারণভাবে আন্দোলটি 'দ্য ব্রাদারহুড' নামে পরিচিত। অপর আন্দোলনটি হলো জামায়াতে ইসলামি বা সংক্ষেপে জামায়াত, যা অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দুটো আন্দোলনটি ১৯২৪ সালে প্রতীকী হিসেবে টিকে থাকা মুসলিম খেলাফতের বিলুপ্তির প্রতিক্রিয়ায় সূচিত হয়। শিয়া বিশ্বেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যার ফলাফল হিসাবে ১৯৭৯ সালে ইরানের বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই নতুন আন্দোলনগুলোর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা– যেমনটা ধর্মীয় ও সামাজিক রক্ষণশীলতার মাঝে নিহিত ছিল। এই আন্দোলনগুলো তাদের ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংগঠনিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আরব বিশ্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। নতুন ধারার সাহিত্য প্রণয়ন এবং ব্যাপক সক্রিয়তার কারণে তারা মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে আলোড়নও সৃষ্টি করতে পেরেছিল। একইভাবে, পশ্চিমে বসবাসরত সংখ্যালঘু মুসলিমদেরও তারা আশান্বিত করতে পেরেছিল। ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের পাখায় চড়ে তারা পশ্চিমে নিজেদের ভাবনা-দর্শনকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার এ কৃতিত্ব আংশিক বিশ্বায়নকেও দিতে হবে।

ইরানের বিপ্লব এখন চার দশকেরও বেশি পুরানো এবং এর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা এখন ক্রমশই উন্মোচিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বাসিন্দাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা সাধনে ব্রাদারহুডের অবদান এবং একইভাবে নানা কারণে কোনঠাসা অবস্থানে থেকেও ইসলামের প্রতি পাকিস্তানের দায়বদ্ধতা ও প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জামায়াতের অর্জন অনস্বীকার্য। তবে অনেক সমালোচকই প্রশ্ন তুলছেন, জামায়াতও কি তাদের গতিপথ থেকে সরে গেছে বা জীবনীশক্তি হারিয়েছে? এটি একটি বড়ো ধরনের বিতর্ক যা আরব বসন্ত এবং এর ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে সামনে চলে এসেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় জামায়াত, সমাজের কিছু অংশে সফলভাবে প্রবেশ করা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি এবং তাই তাদের জনসমর্থন সার্বিকভাবে দুর্বলই থেকে গেছে। যেহেতু জামায়াত 'ইসলামই একমাত্র সমাধান' কিংবা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের মাধ্যমে শাসন' প্রভৃতি বয়াণের জন্য পরিচিত, এই প্রেক্ষিতে নতুন প্রজন্মের তরুণদের সাথে তাদের সংযোগ কম বলেই মনে হয়। তাছাড়া তাদেরকে অতীতের কৌশলগত ভুলের মাশুলও দিতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭০-এর দশকে ইসলামের আলোকে পরিবতর্নের আশায় পাকিস্তান জামায়াত সামরিক স্বৈরশাসকের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল এবং এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জামায়াতও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে গিয়ে পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সমর্থন করেছিল।

এর বাইরে প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো তাদের কাজ করেছে এবং ইতিহাস তাদের মূল্যায়ন করছে। ইতিহাস বলে দেবে, মুসলিমদের পুনর্জীবিত করার এই প্রচেষ্টাগুলো শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে। যাইহোক, একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, এ সবগুলো আন্দোলনই নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে পাশ্চাত্যসহ সারা বিশ্বে মুসলমানদের ইসলাম প্রণোদিত সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এ বাস্তবতাকেই আমরা পরবর্তী আলোচনার মূল সূতিকাগার হিসেবে বিবেচনা করছি।

পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় :

মুসলিম উম্মাহ অত্যন্ত বৈচিত্রময় এবং এই বিচিত্রতা পশ্চিমা দেশগুলিতেও প্রতিফলিত হয়। কেননা সেখানে এখন মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকেই ঐতিহাসিক কিছু কারণে বেশ কিছু জাতিগত সম্প্রদায় ইউরোপীয় দেশগুলোতে তুলনামূলক বেশি মাত্রায়

এসেছে। বিশেষ করে, ব্রিটেনে দক্ষিণ এশীয়, জার্মানিতে তুর্কি এবং ফ্রান্সে উত্তর আফ্রিকানদের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিত্রটি কিছুটা ভিন্ন। সেখানে আগে থেকেই আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল এবং ল্যান্ড অব অপোরচুনিটি হিসেবে এ দেশটি বরাবরই বিশ্বের হাজার হাজার মেধাবী মুসলিম ছাত্রছাত্রী এবং পেশাজীবীদের আকর্ষণ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কালো, বাদামী, সাদা এবং মিশ্র বর্ণের মুসলমানেরা পাশ্চাত্যের আদিবাসীদের পাশাপাশি এখন এ দেশগুলোতে বসবাস করছে। অবশ্য নানাবিধ কারণে তাদের নৃতত্ত্ব ও বিশ্বাস প্রায়ই বিভ্রান্তে ভরপুর থাকে।

বিশ্বায়নের প্রভাবে, সম্ভবত বহু শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো, অতি-রক্ষণশীল থেকে শুরু করে চরম উদারপন্থী কিংবা বিভিন্ন জাতিগত, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির থেকে উঠে আসা আমলদার মুসলিম ও নিছক মুসলিম নামধারী মানুষেরাও এখন একইসাথে বসবাস করছে। তারা যেহেতু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এ কারণে তাদের ধর্মতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক পছন্দ, জীবনধারা এবং ফ্যাশনেও পার্থক্য দৃশ্যমান। একক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা একটি সাদামাটা ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকে আসা মুসলমানদের কাছে এই বহুবিধ বৈচিত্রতা একেবারেই নতুন একটি বিষয়। মুসলিম সংখ্যালঘু দেশগুলিতে এরকম একটি বৈশ্বিক চেহারায় ইসলামের আবির্ভাব একটি অসাধারণ ঘটনা। এর ফলে সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিও যথেষ্ট উদার হয়েছে।

সমাজতাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, ষাটের দশক থেকে, বিভিন্ন কারণে উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম অভিবাসনের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলিতে আসতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে, এই অভিবাসীদের কাছে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো, এখানে টিকে থাকা এবং মৌলিক সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা বিশেষ করে নামাজের স্থান তৈরি ও হালাল খাবারের ব্যবস্থা করা কিংবা একে অপরকে সাহায্য করাই মূখ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু অভিবাসনের হার ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু কিংবা ধর্মান্তরিত মানুষগুলোর আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণের দায় বেড়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে, মুসলিম সম্প্রদায়গুলো ব্যবসা, স্কুল, দাতব্য সংস্থা, মসজিদ এবং কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করতে শুরু করে। বিস্তৃত সমাজ কাঠামোতে গিয়ে একটি পর্যায়ে মুসলিমরা তাদের স্বধর্মীয় এবং আগে থেকে বসবাসরত অন্যান্য ধর্মবালম্বী নাগরিকদের সাথে কাজ শুরু করে। এই বাস্তবতায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সুশীল সমাজ গোষ্ঠী এবং অন্যান্য বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি খাতে চাকরিতে যোগদান এখন একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিমরা ইসলামের মৌলিক নীতিমালায় কোনো আপোষ না করে বরং অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ইতিবাচক অবদান রাখার মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলোর সমাজ কাঠামোতে একীভূত হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পরিচালিত কারি শিল্প ব্রিটিশ অর্থনীতিতে বিলিয়ন পাউন্ড অবদান রাখছে, হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে এবং এরই ফলে বাংলা টাউন ২০১২ সালে ব্রিকলেনকে কারি রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

পশ্চিমা সমাজে বসবাস করতে গিয়ে আমাদের এই সম্প্রদায়গুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যেসব চ্যালেঞ্জ এবং অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে কোনো যুক্তিতেই সেগুলো অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশেই মুসলমানরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনীতিতে খুব সামান্যই অর্জন করতে পেরেছে। ইউরোপের যেকোনো দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারের অনুপাত অনেক বেশি। মুসলিম সম্প্রদায়গুলোতে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার অভাব, মিডিয়া এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সমতা না থাকা এবং মূলধারার মিডিয়া এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর অসহিষ্ণুতা– মুসলিমদেরকে বেশিরভাগ পশ্চিমা দেশেই সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিতে পরিণত করেছে। মুসলমানদের মধ্যে সফলতা ও ব্যর্থতার পার্থক্যও প্রকট। পশ্চিমা কিছু দেশে বন্দীদের মধ্যেও মুসলিমদের অনুপাত সবচেয়ে বেশি। আরেকটি বাস্তবতা হলো, দাতব্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবার মতো কিছু কিছু পেশায় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের হার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি।

১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর থেকে, পশ্চিমা নীতিনির্ধারকরা অসতর্কতাবশত বা অসাবধানতাবশত কমিউনিজমকে 'ইসলামিজম' নামক একটি নতুন চ্যালেঞ্জারের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আটলান্টিকের উভয় প্রান্তের ইসলামোফোবিক মিডিয়া এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো ইসলাম এবং মূলধারার মুসলিম সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে বারবার বন্দুক তাক করেছে। মূলধারার ইসলামি সংগঠনগুলোকে বারবারই মুসলিম বিশ্বে একটি 'সর্বগ্রাসী' খেলাফত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল এই সংগঠনগুলো ৭ম শতাব্দীর আরবের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির

অংশ হিসেবে পেছনের দরোজা দিয়ে ঢুকে পশ্চিমাদের জায়গাটা নিয়ে নিতে চায়। 'ইউরাবিয়া' এবং 'লন্ডোনিস্তান' তত্ত্বের মতো গাজাঁখুরি বয়ানগুলো এক শ্রেণির মিডিয়া ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিশ্বাস করেছে। আমেরিকায় নাইন এলিভেনের নৃশংসতা এবং লন্ডনে ৭/৭ বোমা হামলার ঘটনার পর এসব প্রোপাগান্ডা আরো বেশি গতি পেয়েছে।

মুসলিম বিরোধী কুসংস্কার এবং ইসলামোফোবিয়ার ঢেউ এসেছে ডানপন্থী মিডিয়া, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্য থেকেও। ব্যাপকভাবে মুসলিম বিরোধী প্রচারণার প্রভাবে অর্ধেকেরও বেশি ব্রিটিশ জনগণ মুসলমানদেরকে 'এলিয়েন', অথবা 'একটি সমস্যা' এবং 'দেম (তাদের/অন্য কেউ)' হিসেবে দেখছে বলেই সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে জানা যায়। অন্যান্য জরিপ বলছে যে, মুসলমানরা দেশের সবচেয়ে অনুগত নাগরিক। এই শ্বাসরুদ্ধকর ও ক্ষতিকর 'ইসলামবিরোধী' বয়ানগুলো ক্রমান্বয়ে মূলধারার বয়ানে পরিণত হচ্ছে। ইউরোপের প্রভাবশালী কিছু রাজনৈতিক নেতা মুসলিম বিরোধী প্রচারণাকে আরো বেশি উস্কে দিচ্ছেন। মিডিয়াগুলো ক্রমাগতভাবে মুসলিমদেরকে ধর্মতাত্ত্বিক রক্ষনশীল, কট্টর, ইসলামিক ফ্যাসিস্ট হিসেবে অভিযুক্ত করছে এবং মিডিয়া ট্রায়ালের মুখোমুখি করছে।

এই ম্যাকার্থি টাইপের একপেশে বয়ান থেকে খুব কম সংখ্যক মুসলিম গোষ্ঠীই রেহাই পেয়েছে; ফলে ইতিমধ্যেই মুসলিম জনগণের মধ্যে ভীতিকর একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু মুসলিম বিরোধীরা বলে বেড়াচ্ছেন যে, মধ্যপন্থীরাও আর মধ্যপন্থী নয়, বরং তারা চরমপন্থীদের বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রায় সব পশ্চিমা দেশেই চিত্রটি অনেকটা একই রকম। মার্কিন কংগ্রেসেও মুসলিম উগ্রপন্থা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শুনানি হয়েছে যা মুসলিমবিরোধী অপপ্রচারের উত্তাপকে আরো বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে।

এর বিপরীতে, মুসলিমদের মধ্যেও এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা আলোচনায় থাকার জন্য নানা ধরনের অপরিণামদর্শী আচরণ করছে এবং মিডিয়ার কাছেও ঘৃণাপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে চলমান ঘৃণা ছড়ানোর মতবাদকে আরো বেশি উস্কে দিয়েছে। তাদের পশ্চিমা বিদ্বেষী অবস্থানকে মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে এবং মুসলমানরা কতটা ভয়ঙ্কর তা প্রমাণ করার জন্য এসব বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা এসব সুবিধাবাদী এবং ইউরোপীয় সমাজে থাকা ফ্যাসিস্টরা একসাথে কাজ করছে বলেই বাহ্যত মনে হচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম-বিরোধী অসহিষ্ণুতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা, ইউরোপের অধিকাংশ দেশের রাজনীতিবীদরা তাদের দেশের মুসলিম নাগরিকদের এভাবে একতরফা নেতিবাচক চিত্রায়নের পরিণতি এখনো অনুধাবন করতে পারেনি।

এটি একটি জটিল চিত্র এবং দেশে দেশে এর চিত্র আরো অনেকটাই ভয়াবহ। এরকম স্বল্প পরিসরের একটি নিবন্ধে তা পুরোপুরি তুলে ধরাও সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা যা দেখছি, তা উৎসাহব্যাঞ্জক বা বিরক্তিকর- যাই হোক না কেন, তা আমাদের সম্মিলিত ভূমিকারই ফলাফল। ইসলামিক বা সেক্যুলার, ধর্মীয় অনুশীলনকারী বা ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, ইসলামিক বিভিন্ন গ্রুপ বা বিভিন্ন পটভূমি থেকে উঠে আসা মানুষের জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে যা করেছি কিংবা আমাদের কম্যুনিটির নেতারা সামষ্টিকভাবে যা করেছেন তারই পরিণতিতে আমাদের যাবতীয় সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়েছে।

ইসলামিক গ্রুপ/সংগঠনসমূহ : বাস্তবতা পর্যালোচনা

এই বিশ্লেষণটি মূলত ইসলাম ইসলাম-অনুপ্রাণিত সামাজিক সক্রিয়তা সম্পর্কে আর তাই এ লেখায় এমন গ্রুপগুলোর ওপরই ফোকাস রাখা হয়েছে যারা ইসলামের সুমহান শিক্ষা এবং নেককার পূর্বসরীদের রেখে যাওয়া দৃষ্টান্তের আলোকে সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই গ্রুপগুলো প্রতিটি পশ্চিমা দেশে অসংখ্য স্থানীয় এবং জাতীয় মুসলিম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। নামাজের স্থান, মসজিদ এবং সন্ধ্যায় কুরআনের ক্লাস চালু করার মতো কাজগুলো সাধারণ মুসলিমেরাই করেছিল। পক্ষান্তরে, ইসলামি সংগঠনগুলো পশ্চিমা দেশগুলোতে কমিউনিটি সংগঠন এবং পেশাজীবী সংস্থা গঠন করেছিল। এই সবগুলো কাজ একসাথে মিলে একটি সম্প্রদায় গঠনের ভিত্তি তৈরি করেছে। ফোকাস নির্ধারণ, অগ্রাধিকার এবং সম্পদের দিক থেকে মুসলিম এই গ্রুপগুলো বিদ্যমান অন্যান্য গ্রুপ থেকে ভালো পারদর্শিতা দেখিয়েছে। সম্মিলিতভাবে, এই সবগুলো গ্রুপ এই দেশগুলোতে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু অবদান রেখেছে। এই গ্রুপগুলোর মধ্যে কেউ কেউ মুসলিমদের শিক্ষিত করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন, কেউ বা ইসলামিক স্কুল স্থাপনে সহায়তা করেছেন আবার কিছু গ্রুপ মূলধারার শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অবদান রেখেছেন, একইভাবে কেউ কেউ রাজনৈতিক

প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে মুসলমানদের ভোট দিতে উৎসাহিত করেছেন, আবার কেউ কেউ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়েছেন। আবার কিছু গ্রুপ নৈতিক ও ইসলামিক দাতব্য সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন কেউ বা মুসলিম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করেছেন। অনেকে আবার মুসলিমদেরকে বৃহত্তর সমাজের মূল ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্য বিশ্বাসী গোষ্ঠী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এত সব কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্য যথ যথ একটি অবস্থান তৈরি করা যাতে তারা পশ্চিমা সমাজের বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্যের সাথে সহজে মিশে যেতে পারে।

এ ধরনের কার্যক্রম ইতিবাচক এবং উৎসাহব্যাঞ্জক। কিন্তু এরপরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এখনো দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে। কোন কোন খাতে মুসলিমরা সফল হতে পারেনি, সে বিষয়গুলো এবার একটু পর্যালোচনা করা যাক। এ পর্যায়ে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমি শ্রেণিবিন্যাস করেছি। আবারও বিনয়ের সাথে বলছি, এটি একান্তই আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং আমার সাথে দ্বিমত করার সম্পূর্ণ অধিকার পাঠক-পাঠিকাদের রয়েছে।

১. ইসলামি সংগঠনগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও বিভাজন :

বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে আসা ভিন্ন ভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে একত্রিত করার ক্ষেত্রে যে সব চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে- তা সহজেই বোধগম্য। এও স্বাভাবিক যে, ইসলামি দলগুলো তাদের জন্মভূমি থেকে ধর্মতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবে। সুন্নি এবং শিয়া মুসলমানদের প্রধান দুটি দল এবং দীর্ঘ সময় ধরেই এ দুটো গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্য লালন করে। কিন্তু বর্তমানে যে দলগুলো খুব বেশি দৃশ্যমান তারা মুসলিমদেরকে সালাফিবাদ, সুফিবাদ, বেরেলবাদ, দেওবন্দবাদ এবং আন্দোলনের মতো নানা নামে বিভক্ত করে রেখেছে। যদিও আধুনিক যুগের মুসলমানদের এই বাস্তবতার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে যেখানে আটলান্টিকের দু প্রান্তেই কিছু ডানপন্থী থিংকট্যাংক নিজস্ব আদর্শিক উপায়ে মুসলমানদেরকে উদারপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, মধ্যপন্থী, সুফি, ঐতিহ্যবাদী এবং ইসলামপন্থীসহ নানাভাবে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছে। এর মাধ্যমে তারা পশ্চিমা সরকারগুলোকেও বার্তা দিতে চাইছে যে, তাদের কার সাথে কাজ করা উচিত এবং কী মাত্রায় করা উচিত। এই বিভাজনমূলক এজেন্ডা বরাবরই অনুৎপাদনশীল এবং বিপজ্জনক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

কয়েকটি দেশে অবশ্য প্রভাবশালী মুসলিম নেতারা মুসলিম গ্রুপগুলোকে একটি অভিন্ন কাঠামো এবং সমন্বিত অবস্থানের ভিত্তিতে একজোট করার চেষ্টা করেছেন। কিছু জায়গায় এ ধরনের প্রয়াস সফলতাও পেয়েছে। তবে মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনের কথা যদি বলি, এখানে সত্যিকারের সংহতি এখনো অনেকটাই দূরাশা। অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃগ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও যথেষ্ট মাত্রায় রয়ে গেছে এবং এ ধরনের অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা অনেক সময় গোটা সম্প্রদায়ের সুনামকেই ক্ষতির মুখে ফেলে দেয়। এ ধরনের বিভাজন অবশ্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভেতরও দৃশ্যমান। এমনকী ইহুদিদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে বিভাজন রয়েছে। আশা করা যায় যে, পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম নেতাদের হাত ধরে এই বিভক্তি-বিভাজনের মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।

২. যুব ও নারীদের সম্পৃক্ততা :

যে কোনো সম্প্রদায় বা জাতিকে যদি অগ্রসর হতে হয় তাহলে তাদেরকে একইসাথে যুব সম্প্রদায়ের সৃজনশীলতা ও প্রবীণ প্রজন্মের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু যুবক বা যুবতীদের সম্ভাবনাগুলোকে নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ইসলামি সংগঠনগুলো এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। আমাদের সম্প্রদায় ও ইসলামিক সংগঠনগুলো এখনো পর্যন্ত তাদের বিপর্যয়ের নেপথ্যে এ ধরনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষাই করে গেছে। ফলশ্রুতিতে, অধিকাংশ ইসলামিক সংগঠনেই সৃজনশীল চিন্তাধারার অভাব রয়েছে এবং সাংগঠনিকভাবেও তারা এক ধরনের স্থবিরতায় আঁটকে আছে। এটি সত্য যে, বেশ কিছু যুব সংগঠন চমৎকার কিছু কাজ করেছে, তবে এগুলো ছিল একদমই স্থানীয় পরিসরে। সার্বিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর কিংবা বৃহত্তর সমাজে এই কার্যক্রমগুলোর তেমন কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে, নতুন প্রজন্মের মুসলিমরা বিদ্যমান ইসলামি সংগঠনগুলোর আশপাশেই রয়েছে আবার অনেকেই এমন আছে যাদের এই সংগঠনগুলো নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ নেই। অন্যদিকে, নারীদের সম্পৃক্ততা আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নারীদের সম্পৃক্ততা এখনো অনেকটাই কম।

দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে, যুব প্রজন্মের মধ্যে একটি অংশ তাদের পূর্বসরীদের খুবই কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে এবং প্রবীণদেরকে মুসলিম সম্প্রদায়ের

যাবতীয় সংকটের জন্য দায়ী বলেই গন্য করে। তাদের অনেকেই কম্যুনিটি কার্যক্রম থেকে সচেতনভাবে দূরে থাকে। কম্যুনিটির বয়োজেষ্ঠ সদস্যদের থেকে প্রেরণাদায়ক তেমন কিছু না পাওয়ায় অনেকেই কম্যুনিটির জন্য নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার প্রমাণ রাখতে কিংবা সেবামূলক কোনো অবদান রাখতে পারছে না। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যুবকদের সংখ্যা অনেক এবং তাদের হাত দিয়ে অলৌকিক কিছুও ঘটে যাওয়া সম্ভব। আশা করা যায়, এসব যুবক যুবতীদের কিছু অংশ কম্যুনিটির জন্য এবং পরবর্তীতে দেশের জন্য কিছু করার দায় অনুভব করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যুব সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই নানা ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকার দায়ে পশ্চিমা দেশগুলোর কারাগারে আটক অবস্থায় রয়েছে।

৩. দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব :

অনেক গ্রুপ বা সংগঠনই ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার কিংবা দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার কথা বললেও তাদেরকে এখন সেকেলে হিসেবে গন্য করা হচ্ছে। ফলে তাদের কার্যক্রমের খুব যৎ সামান্য প্রভাবই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইসলামের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হলো, আশপাশের মানুষের সাথে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহার। দু:খজনক হলেও সত্য যে, অনেক মুসলিমের মাঝেই এ ধরনের উন্নত ব্যবহার এখন আর দৃশ্যমান হচ্ছে না।

মুসলিম বিশ্ব থেকে কাঠামো ও কর্মকৌশল ধার করে নিয়ে আসার কারণে পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিমদের অনেক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ফলাফলের চেয়ে বরং প্রক্রিয়া নিয়েই বেশি ব্যস্ত রয়েছে। অল্প কথায় বলতে গেলে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত নেতৃত্ব বা দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্বের সুস্পষ্ট অভাব রয়েছে। এই অভাবটি নতুন লোকদের অংশগ্রহণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্বের প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমাদের সময়ের ইসলামি সংগঠনগুলোর জন্য এটিই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এই স্থবিরতাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু দলে আবার আভ্যন্তরীণ পদ পদবি নিয়ে রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছে। একটি ছোট্ট পৃথিবীর ভেতর নিজেদের আবার আরো ছোট একটি বাক্সে আবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কুয়োর ব্যাঙ হওয়ার এই মানসিকতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাইরের ঘটনাবলী থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন।

৪. ধর্মীয় ভাষ্য ও চলমান পরিস্থিতি : ধর্মতাত্ত্বিক নিরাপত্তাহীনতা

কিছু কিছু সংগঠন আবার ফিকাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে উদাসীন থাকার কারণে আভ্যন্তরীনভাবে বিভাজনের মুখে পড়েছে। যদিও একটি সময়ে ইসলামি সংগঠনের ভেতর নির্বাচনে অংশগ্রহণ, গণতন্ত্র, নিকাব (মুখ ঢাকা) ইত্যাদি নিয়ে যে ধরনের বিতর্ক হতো, সে তুলনায় পরিস্থিতি এখন অনেকটাই উন্নত হয়েছে; এরপরও অতিরিক্ত রক্ষনশীলতা কিংবা এর বিপরীতে চরম উদারতার প্রতি কিছু মানুষের আগ্রহ এখনো রয়েই গেছে। ফলে, বিভাজনও দূর হয়নি। ইসলাম একটি মধ্যমপন্থী জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে জীবনের অগ্রাধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ফরজ, সুন্নাহ, নফল হিসেবে ইবাদতের শ্রেনীবিন্যাস করেছে। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে কোন কাজগুলো অপরিহার্যভাবে করতেই হবে আর কোন কাজগুলো করা জরুরি- ইসলাম তাও শিখিয়েছে। মোটা দাগে ইসলামের একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সাধারণভাবে সব কিছুই গ্রহণযোগ্য যদি না আলাদা করে কোনো বিষয়কে নিদিষ্টভাবে হারাম করা হয়।

তবে এখনো বেশ কয়েকটি ইসলামি সংগঠনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে এ ধরনের বিষয়গুলো অগ্রাহ্যই করতে দেখা যায়। ধর্মীয় অনুশীলনকে সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন করার একটি প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় ভাষ্যগুলো আলোচনা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। এভাবে পরিস্থিতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষ্য বা বয়ান প্রদানের কারণে কিংবা এদেশের পরিসরে ভালো মানের ওলামা তৈরি না হওয়ায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ফিকাহ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও প্রায়শই বিতর্ক সংঘটিত হতে দেখা যায়। এর ফলে, ইসলামিক গ্রুপগুলো শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে আর যুক্ত থাকতে পারে না এবং নিজেদের কাজগুলোও সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না।

সার্বজনীন কল্যাণের জন্য নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি :

এটি অনুধাবন করা জরুরি যে, আধুনিক পশ্চিমা সমাজগুলো মূলত নিয়মভিত্তিক; পাশাপাশি মানুষের স্বাভাবিক শালীনতা জিইয়ে রেখে তারা গণতন্ত্রকেই মূল ভিত্তি হিসেবে বেছে নিয়েছে। যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই নাগরিক অবস্থান থেকে কিংবা রাজনৈতিক পন্থায় নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে এবং যতক্ষণ না আইন ভঙ্গ হয়, মানুষ কথা

বলতে পারে এবং অন্যকেও প্রভাবিত করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসারও চেষ্টা করতে পারে। অন্য সব সম্প্রদায়ের মতো মুসলিমদেরও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনমত গঠনের সুযোগ রয়েছে। যদিও এও ঠিক যে, লেভেল প্লেইং ফিল্ড না থাকলে তুলনামূলক দুর্বল সম্প্রদায়গুলোকে অনেক সময় প্রান্তিক পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সে যাই হোক না কেন, সমাজে টিকে থাকার ও সমৃদ্ধি অর্জন করার নিয়মগুলো মুসলিমদের শিখতেই হবে। উদারতা এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করার মতো গুণাবলিগুলো তাকে অর্জন করে নিতে হবে। বিদ্যমান কাঠামোর ভেতরে থেকেই ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার অনেক ধরনের সুযোগ ও অবকাশ এখনো রয়ে গেছে। ইসলামে নীতি ও ধর্মতত্ত্বের ভেতর এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়গুলো আসলে কী? ইসলামে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা স্পষ্ট; এগুলো হলো দ্বীনের মূল এবং ভিত্তি। এর বাইরে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। যে বিষয়গুলো একদমই গ্রহণযোগ্য নয়, এর বাইরেও আরো অনেক কিছুই পৃথিবীতে হয় যেগুলো গ্রহণ করার বা মেনে নেওয়ার সুযোগ আছে। আমাদের ধর্মের ভিত্তি ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। তবে একইসঙ্গে মুসলিমদের এই চেষ্টাও করা উচিত যাতে অপর মানুষগুলোর কাছে ইসলামকে খুব কঠিন মনে না হয়। বাক স্বাধীনতা, আইনের শাসন, জবাবদিহি, ইনসাফ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা সম্মতি– এগুলোই সর্বজন গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধ এবং এই মূল্যবোধগুলো ইসলামের ভেতরই নিহিত।

আবার রাজনৈতিক কিছু বিষয় আছে যা কিছু সময়ের জন্য ইসলামি দলগুলোকে স্থবির করে দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে 'সার্বভৌমত্ব' ইস্যুর কথা বলা যায়। এ ধরনের ইস্যু থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন তবে অসম্ভব নয়। সার্বভৌমত্বের ইস্যুতে, কোনো মুসলমানেরই সন্দেহ নেই যে নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা, তেমনি মহাবিশ্বের সবকিছুও আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহর খলিফা বা দূত হিসেবে, মানুষকে এই পৃথিবীতে মানুষকে নিজস্ব কাজগুলো পরিচালনা করার সক্ষমতা দিয়েই পাঠানো হয়েছে, যতক্ষণ না তা ইসলামের মূলনীতির বিরুদ্ধে চলে যায়। ধর্মতত্ত্ব-সম্পর্কিত এ ধরনের বিষয়াবলী নিয়ে মুসলিমরা বেশ অনেকদিন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তর্কবিতর্ক করেছে। এখন এ ধরনের বিতর্ক থেকে সরে আসার সময় হয়েছে।

যে সমাজে মুসলিমরা বাস করছে সেখানে সম্পৃক্ত হওয়া মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য। তাদেরকে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত, ইনসাফপূর্ণ ও ভালো সমাজ গড়ার লক্ষ্য নির্ধারন করতে হবে এবং এরকম একটি সমাজ বিনির্মাণের জন্য তাদেরকে নিবেদিত হতে হবে। সমাজের জন্য যা ভালো সে ব্যাপারে মুসলিমদের একমত হতে হবে এবং একইসাথে ক্ষতিকর কোনো কিছু দেখলে নাগরিকবিধি অনুসারেই তা চ্যালেঞ্জ করতে হবে। মুসলিমদেরকে অবশ্যই শক্তি, প্রেরণা, গতিশীলতা এবং সৃজনশীলতার জন্য অনকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যত প্রজন্মকেও একই স্বপ্ন নিয়ে কাজ করতে উজ্জীবিত করতে পারে। এই চ্যালেঞ্জিং সময়েও যদি ইসলামি দলগুলো এই অপরিহার্যতা বুঝতে না পারে বা তাদের সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিতে না পারে তাহলে পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিম ভবিষ্যত সত্যিই অন্ধকার।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন এমনিতেই চলে আসে। কেন অন্যান্য দল, বিশেষ করে যারা ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নয় তারাও কেন তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হচ্ছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অন্যরাও সম্ভবত তাদের নিজস্ব উদ্ভাবনী চিন্তা, টেকসই উদ্যোগ এবং সম্পদের সংস্থান করতে অক্ষম। টানা কয়েক দশক হতাশার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর যুবকেরা এখন তাদের বর্তমান নেতাদের বাইপাস করে নিজেদের মতো করে উদ্যোগ নিয়ে আরব বিপ্লবকে কার্যকর করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

প্রশ্ন হলো, জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক দল বা সংগঠনগুলো নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে এবং একইসাথে নিজেদের কৌশলগুলোকে পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপগুলো নিতে পারে? ৯/১১-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি বৃহত্তর নাগরিক এজেন্ডা নির্ধারণের ক্ষেত্রেই বা তারা কোন্ ধরনের বাস্তব উদ্যোগ নিতে পারে কিংবা রাজনৈতিক ও মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান আক্রমণ থেকে নিজেদের বিপর্যস্ত সম্প্রদায়কে তারা কীভাবে রক্ষা করতে পারে? অথবা কীভাবে তারা চলমান সময়ের চাহিদাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে পারে? বিশেষ করে, মুসলমানদের মধ্যে শক্তি ও আশাবাদ তৈরির জন্য প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেই বা তারা কী করতে পারে?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত

কোনো প্রেসক্রিপশন নেই। মূলত সম্মিলিত প্রয়াসের মাঝেই এসব প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে আর সবাইকে এক্ষেত্রে একসাথেই কাজ করতে হবে। সম্মিলিত এ যাত্রায় আমাদের সকলের ভূমিকা আছে। আমরা সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণে এ ভূমিকা রাখতে পারি। সবচেয়ে বড়ো কথা, আরো অনেকগুলো খাত আছে যেক্ষেত্রে আমাদের আরো ভালো করার সুযোগ রয়েছে। এই পর্যায়ে, আমি আমার চিন্তাধারাগুলোকে নিম্নোক্ত পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছি। এর বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে। কীভাবে আমরা এই প্রয়াসগুলোকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারি তা নিয়েও আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে। তবে সেগুলো আমার এই নিবন্ধের পরিধির বাইরে।

ক) আমাদের শিকড়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া :

আমাদের শক্তির প্রকৃত উৎসের কাছে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর করতে হবে। ইসলামের মূল নীতিমালা এবং এ মাটি ও মাটির সন্তানদের সাথেও সম্পর্ক উন্নত করতে হবে। আমরা যা কিছুই করতে চাই না কেন, সর্বাগ্রে আমাদের শিকড়ের সাথে শারীরিক, আধ্যাত্মিক, আবেগজাতভাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যুক্ত হতে হবে।

আমরা আল্লাহর জন্যই এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব (আল কুরআন ২ : ১৫৬)। আল্লাহ আমাদের শিরার রগের চেয়েও বেশি নিকটে (৫০ : ১৬) এবং আমাদের সন্তান, বাবা-মা, পরিবার ও নিজের থেকেও নবিজি মুহাম্মাদ (সা.) আমাদের বেশি প্রিয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর প্রতি নিঃশর্ত এই ভালোবাসা মানুষসহ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আমাদের ভালোবাসা আরো বাড়িয়ে দেয়। এই ভালোবাসা বিশ্বাসী মানুষগুলোকে নিজেদের শুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং মানবতার কল্যাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এটি বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ রাখতে এবং দায়িত্ববোধ জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এ বিষয়গুলো অন্য কোনো বিশ্বাস বা পন্থায় কখনোই অর্জন করা যায় না। এই সত্যকে যথাযথভাবে অনুধাবন করে এবং প্রিয় নবি (সা.) কে সঠিকভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমেই মুসলিমরা তাদের সৃজনশীল সময়ে নিজেদেরকে বরকতময় একটি উম্মতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই উপলব্ধি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আবারও এ পৃথিবীকে একটি উন্নত স্থানে পরিণত করতে পারবো যদি আমরা পুনরায় আমাদের উৎসগুলোর সাথে পুনঃসংযোগ স্থাপন করতে পারি এবং আমাদের শক্তিগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে পারি।

খ) প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ :

মুসলিমরা এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার ও প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। আমাদের এখন এ কাজগুলোকে সমন্বয় করতে হবে এবং পেশাদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। কমিউনিটি বা সংগঠন বা বিশেষ কোনো সংস্থা যারাই এসব সেন্টার বা মসজিদগুলো তৈরি করেছেন; এর নেপথ্যে তাদের একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য, কার্যকর কৌশল এবং মুসলিম ও অমুসলিম সবার জন্যই কল্যাণকর কিছু করার মানসিকতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, এসব সংগঠনের সংবিধান, নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতিগুলো যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত, উন্মুক্ত ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। সংগঠনগুলোকে নিয়ম-ভিত্তিক হতে হবে এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সুস্পষ্ট উত্তরাধিকার পরিকল্পনা থাকতে হবে। এই সংগঠনগুলোর সকল পর্যায়ে যুবক এবং বৃদ্ধ, চিন্তাশীল এবং কর্ম, শক্তি এবং প্রজ্ঞার মিশ্রণ ঘটা কাম্য।

এর পাশাপাশি, যেখানে সম্ভব, এসব সংগঠনের উচিত ওয়াকফ (অনুদান) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া যায়। মুসলিম সংগঠনগুলোকে যতটা সম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বচ্ছ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এ ধরনের সংস্থা বা সংগঠনের কোনোভাবেই দল বা ব্যক্তি নির্ভর হওয়া উচিত নয়।

গ) শিকড়ের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃত্ব তৈরি :

সবচেয়ে যোগ্য ও নিবেদিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকেই ইসলামি সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব বাছাই করতে হবে অথবা গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন করতে হবে। তরুণ মুসলিম– যাদের ভেতর সৃজনশীলতা, দৃঢ় সংকল্প, শক্তি ও উজ্জীবনী শক্তি রয়েছে তাদেরকে এই সংগঠনগুলোর নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে নিয়ে আসা উচিত। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি আনুগত্য, সমাজের মঙ্গলের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং নির্মোহ পর্যালোচনা করার মতো জবাবদিহিতা নেতৃত্বের মূল নীতিমালার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

নেতৃত্বের উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত; যুবক থেকে বৃদ্ধ সবাইকে তাদের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করাও প্রয়োজন। নেতৃবৃন্দের উচিত শিকড়ের সাথে সংযুক্ত থাকা আবার একই সংগে সময়ের বাস্তবতা অনুধাবন করা এবং ইসলামের নীতিমালার প্রতি দায়বদ্ধ ও সৎ থেকে পরিস্থিতির সাথে মানানসই কার্যক্রম পরিচালনা করা। স্বধর্মীয় লোকদের (উম্মত) প্রতি দায়িত্ব এবং কাওম (যাদের সাথে আমরা বাস

করি) এবং আত্মীয় স্বজন ও সমাজের প্রতি বিদ্যমান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য করার সক্ষমতা থাকা উচিত। সামাজিক কার্যক্রম বা আন্দোলনকে অর্থবহ করার জন্য এই আন্দোলনের কর্মীদের অবশ্যই সৃজনশীল হতে হবে আবার একইসঙ্গে পরিবর্তন ঘটানোর মতো সক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। শুধুমাত্র অন্ধ অনুসরণ করা কখনোই কাম্য নয়; যদিও অনেক ইসলামি সংগঠনে এমনটাই দেখা যায়।

ঘ) সক্ষমতা তৈরি :

মানব ও বস্তুগত সম্পদ উন্নত করার মাধ্যমে মুসলিম সংগঠনগুলোর আভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একইসাথে এই সম্পদগুলো পরিচালনায় কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম, ইসলামের মৌলিক চেতনারই একটি অংশ। স্বেচ্চায় কাজ করার একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা মুসলিমদের মধ্যে গড়ে তোলা উচিত। তবে একটি কার্যকর সংগঠন কখনোই শুধুমাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর ভর করে থাকতে পারে না।

সক্ষমতা নির্মাণের জন্য যোগ্য, দক্ষ ও উজ্জীবিত লোকদেরকে সকল স্তরেই যুক্ত করা প্রয়োজন। সংগঠনকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কিংবা গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, কার্যকরী ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। মুসলিম সংগঠনগুলোকে চলমান অনুন্নত অর্থায়নের চক্র থেকে বের হওয়ার উপায় বের করা উচিত কেননা এ ধরনের দুর্বল অর্থায়ন সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে।

সক্ষমতা বিনির্মাণ বলতে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, পিতামাতাকে প্যারেন্টিং স্কিলে সমৃদ্ধ করা এবং সাধারণ মুসলিমেরা প্রভাবিত হয় এ ধরনের ইস্যুগুলো মোকাবেলায় তাদেরকে সহায়তা করাকেই বোঝানো হয়। পেশাদার হিসেবে সফল কিংবা অন্যান্য জীবনঘনিষ্ঠ দক্ষতায় সমৃদ্ধ মুসলিমদের সামনে এগিয়ে আসা উচিত এবং এ ধরনের সংগঠনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়া উচিত।

ঙ) পরিপূরক ও সমন্বিত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা :

এটি স্পষ্ট যে, কিছু কাজ একাধিকবারও করা হয়ে যাবে, কারণ মুসলিম সম্প্রদায়গুলো বৈচিত্রময় হলেও একটি একক সম্প্রদায় হিসেবে তাদের বিবর্তন প্রক্রিয়া কখনোই খুব সাবলীল ছিল না। এও বোধগম্য যে, বৃটেনের মুসলিম

> “যার দুটো দিন একইরকম হলো (কাজের দিক থেকে), নিশ্চিতভাবেই সে লোকসান করলো।
> (সুনান আল দায়লামি)

কাউন্সিলের মতো মুসলিম সংগঠনগুলোর জোটগুলো যাবতীয় সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এ ধরণের পুনরাবৃত্তি এড়াতে ইসলামি দলগুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যকরী প্রোটোকল তৈরি করা। প্রতিটি সংস্থারই লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজের জন্য যথাযথ অবস্থান তৈরি করা এবং যে কোনো একটি কাজের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা অর্জন করা। একটি খাতে বিশেষভাবে দক্ষ হলেও সামগ্রিক প্রক্রিয়াকেই কার্যকরী করার চেষ্টা থাকা উচিত। এটি মুসলিম সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করার এবং মুসলমানদের ভেতর সংহতি বৃদ্ধির একটি ভাল উপায় হতে পারে।

মুসলিম সংগঠনের এমন কিছু কাজে জড়িত হওয়া উচিত যেখানে তাদের প্রত্যেকেরই পারদর্শীতা দেখানোর সুযোগ রয়েছে। গড়পড়তায় কিছু করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। যদিও ভাল মানের পারদর্শিতা দেখানোর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা অনেক সময় ইতিবাচকও হয়; তারপরও অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা থেকে সচেতনভাবেই দূরে থাকার চেষ্টা করা দরকার। বৃহত্তর সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি মুসলিম সংগঠনগুলোর দেখা উচিত এবং সামগ্রিক অর্থেই তাদের অবদান রাখা উচিত। এখানে আরো মনে রাখা দরকার যে, একটি সংগঠনের প্রকৃত মর্যাদা তার আভ্যন্তরীণ শৃংখলার মাঝেই নিহিত থাকে।

উপসংহার :

একজন মুসলিমের জন্য অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রকৃত উৎস হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলো পূরণ করা এবং একইসঙ্গে এই জমিনে আল্লাহর খলিফা হিসেবে ব্যাপকভাবে সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়া। কারণ মানুষকে শেষ বিচারের দিনে পার্থিব কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ভারসাম্যপূর্ণ ও সম্প্রীতিতে ঘেরা একটি পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য ইসলাম তার অনুসারীদের আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত এবং সামাজিক পরিসরে সক্রিয় হতে অনুপ্রাণিত করে। 'উত্তম কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় করতে নিষেধ করা' (আল-কুরআন ৩ : ১১০) একটি মুসলিম সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে পাপ বা সীমালংঘন করতে নয় বরং নেকি ও তাকওয়া অর্জনের পথে একে অপরকে সাহায্য করার শিক্ষা দেয়। (আল-কুরআন ৫ : ২) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ অসাধারণ পন্থায় একজন বিশ্বাসী মানুষকে এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে এবং একইসাথে সমাজের জন্য একটি সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করার জন্যেও প্রস্তুত করে। সামাজিক সক্রিয়তার এ বিষয়টি তাই প্রতিটি মুসলিমের মানসিকতার মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া উচিত।

ইসলামি শিক্ষায় উজ্জীবিত মুসলমানদের যে কোনো কাজের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। তাহলেই আমরা নিজেদের নির্মোহ পর্যালোচনা করতে পারবো। এতে করে, অন্যের প্রতি আঙ্গুল না তুলে বা অন্যকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমরা বরং প্রচলিত চিন্তাধারার বাইরে ভাবতে শিখবো।

কোথায় কোথায় আরো উন্নতি করা প্রয়োজন এ বিষয়গুলো মুসলিমদের একটু সময় নিয়ে ভাবা উচিত। ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন মুসলিম, কিংবা সামষ্টিক পরিসরে একটি সংগঠন কেবলমাত্র অর্জনগুলো নিয়েই আত্মতুষ্টিতে ভুগতে পারে না। তাদের বরং বড়ো কিছু উদ্দেশ্য লালন করা উচিত এবং একটি উন্নত আগামী গড়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। রাসুল (সা.) এর নিম্নোক্ত হাদিসটি আমাদের সবারই বারবার স্মরণ করা উচিত।

"যার দুটো দিন একইরকম হলো (কাজের দিক থেকে), নিশ্চিতভাবেই সে লোকসান করলো। (সুনান আল দায়লামি)

পশ্চিমে বসবাসরত প্রতিটি মুসলিমেরই ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সার্বিকভাবে ইসলামি সংগঠনগুলোর নিজেদের কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। কারণ এ দেশটিকেই তারা নিজেদের আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছে এবং এখানেই তাদের পরবর্তী প্রজন্মরাও বসবাস করবে। একমাত্র ইসলামের চেতনাই মানুষকে সার্বজনীন কল্যাণ সাধনে উজ্জীবিত ও সক্রিয় করে তুলতে পারে এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান করতে পারে। কার্যত, মুসলিমেরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামের সার্বজনীন, প্রাগ্রসর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পন্থায় কতটা গড়ে তুলতে পারছে– তার ওপরই মুসলিমদের বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

লেখক : শিক্ষাবিদ, প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞ; সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন।

অন্যান্য ধর্মীয় এবং ধর্ম বহির্ভুত সম্প্রদায়ের মাঝে নবীজি (সা.) যেভাবে দাওয়াতি কাজ করেছিলেন সে তুলনায় আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের (ইহুদি ও খৃষ্টানদের) কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একদমই আলাদা। যেমন: ইহুদিদের কাছে তিনি প্রধানত ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা এবং সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেন। অন্যদিকে, তাওহিদের (আল্লাহর একত্ববাদ) বার্তাটি ইহুদি ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে ঐতিহ্যগত শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং সংশোধন হিসাবে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। এই সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলি মদিনা সনদের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদন করা হয়েছিল। আর মদিনা সনদ হলো এমন একটি চুক্তি যা আহলে কিতাবসহ সকল সম্প্রদায়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

তৎকালীন সময়ে মুসলিম এবং ইহুদি জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্ক জটিল ছিল, যদিও আল কুরআন 'আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের ঐতিহাসিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পকটি একটি কাঠামোগত রূপ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমসাময়িক সহযোগিতা এবং সংঘাত- দু ধরনের ঘটনাবলীরই প্রভাব ছিল। পাশাপাশি, সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিশীলতাও এই আন্তঃসম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে, খৃষ্টানদের মধ্যে নবীজি সা. এর দাওয়াতি তৎপরতা চালাতে গিয়ে ততটা বেগ পেতে হয়নি। খৃষ্টানদের সাথেও নবীজি সা. ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা করতেন এবং তাদেরকে আল্লাহর লোক হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। নাজরান থেকে একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল আসার পর তিনি তাদের সাথে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা থেকে এই দাবির সত্যতা পাওয়া যায়।

রাসূল সা. নাজরান থেকে আগত খৃষ্টান প্রতিনিধিদলকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মদিনায় থাকার জন্য তাদেরকে নিজের মসজিদের কাছেই একটি নিরাপদ জায়গা প্রদান করেছিলেন। আন্তরিক আতিথেয়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। খৃষ্টানদের অনুসৃত কিতাবের সাথে আল কুরআনের পার্থক্য থাকলেও নবীজি সা. এই মেহমানদের সাথে একটি সম্মানজনক কথোপকথন বজায় রেখেছিলেন। মতবিনিময়ের পর, নাজরানের খৃষ্টানেরা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলেছিল, "হে আবু আল কাসিম, আপনি আমাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দিলেন, যেন আমরা যা ছিলাম তাই আছি। আর আপনাকেও আমরা এমনভাবে রেখে যাচ্ছি যেন আপনি যা ছিলেন আপনি এখনো তাই রয়ে গিয়েছেন।" তবে আমাদের সম্পদ নিয়ে বিবাদ নিরসনের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি আমাদের মাঝে প্রেরণ করুন। কারণ

আপনার ফায়সালার ওপর আমাদের আস্থা আছে।” নবীজি সা. তাদের অনুরোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সাক্ষীদের সাথে তাদের জীবন, সম্পত্তি এবং ধর্মের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে একটি লিখিত আশ্বাস প্রদান করেন।

কুরআন প্রায়ই ইহুদি এবং খৃষ্টানদের সম্বোধন করে তাদের নবীদের সাথে সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তাওহিদের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার সময় তাদের বিচ্যুতিগুলোও সংশোধন করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল-বাকারাহ (২:১৩৬), আয়াতটি ইসলাম এবং পূর্ববর্তী নবীদের প্রচার করা বিশ্বাস বা চেতনার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে।

“বলুন, [হে ঈমানদারগণ], আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং যা মূসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছিল এবং যা তাদের রবের পক্ষ থেকে নবীদের দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, এবং আমরা তাঁর প্রতি [আনুগত্যশীল] মুসলিম।

এই আয়াতটি মুসলিম, খৃষ্টান এবং ইহুদিদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং বিভিন্ন নবীকে প্রদত্ত ওহীর সত্যতা তুলে ধরে। আর আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না,চ এই আয়াতটি একই আসমানী বার্তার বার্তাবাহক হিসাবে সকল নবীদের সমতাও নিশ্চিত করে। এই আয়াতটি তাওহিদের ধারাবাহিকতা হিসাবে নাজিলকৃত সকল ওহীর সারমর্মকে ধারণ করে সবাইকে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়।

অন্যদিকে, সূরা আলে ইমরানে (৩:৬৪), আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, এমন একটি কথার দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না এবং আল্লাহর পরিবর্তে একে অপরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না।

এই আয়াতটি মুসলমানদের এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে কমন গ্রাউন্ডে সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে। আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদারকে শরীক না করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এই আয়াতটি মানুষকে ঐশ্বরিক মর্যাদায় উন্নীত করার বিরোধিতা করে। একইসঙ্গে, প্রকৃত তাওহীদের প্রচারকে উৎসাহিত করে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ধর্মীয় বোঝাপড়াকে সমর্থন করে।

অন্যদিকে, সূরা আল-আনকাবুতে (২৯:৪৬) আল্লাহ ইরশাদ করেন,

“আর সর্বোত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে তর্ক করো না। যারা তাদের মধ্যে অন্যায় করে এবং বলে, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি এবং আমাদের আল্লাহ আর আপনাদের আল্লাহ এক। এবং আমরা তাঁর প্রতি [আনুগত্যশীল] মুসলমান।

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে সম্মানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানায়। অন্যায্য ঘটনাবলী ছাড়া অন্যান্য সাধারণ ঘটনার ক্ষেত্রে সংঘাত বা বিবাদ এড়িয়ে বরং উদারতা এবং প্রজ্ঞার সাথে আলোচনা করতে উৎসাহিত করে। আহলে কিতাব ও মুসলিমদের বিশ্বাসের যে সামঞ্জস্যতা এই আয়াতটি তা স্বীকার করে। এই আয়াতটি নিশ্চিত করে যে, অন্যান্য একেশ্বরবাদীরা যে আল্লাহকে মানেন, ইসলামও সেই একই আল্লাহর কথা বলে। এই আয়াতটি সর্বশেষ অংশে দাবি করে যে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণই সকল প্রকাশিত ধর্মের সার কথা।

আহলে কিতাবের সাথে প্রতিদিনের আলাপচারিতায়, নবী মুহাম্মাদ সা. কুরআনের এই নির্দেশনাগুলোই মেনে চলতেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তার ইহুদি প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। একবার তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। তখন সেখান দিয়ে একটি ইহুদি ব্যক্তির লাশ নিয়ে কিছু লোক শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল। নবীজি সা. তখন তাদের সম্মানে কিছু সময় স্থির দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, এটি কি মানুষের রূহ নয়?চ এই মন্তব্য ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাকে প্রতিফলিত করে। অন্য একটি উদাহরণও দেওয়া যায়। যখন একজন ইহুদি মহিলা তাকে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল, এবং মহিলার পরিচয় ও কুকীর্তি ধরা পড়ে গিয়েছিল, তখন নবীজি সা. প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে তাকে ক্ষমা করেছিলেন। এ ঘটনার মাধ্যমে রাসূল সা. তার সহজাত ক্ষমাশীল প্রকৃতি এবং দাওয়াহ পদ্ধতির অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিশর

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তার ইহুদি প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। একবার তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। তখন সেখান দিয়ে একটি ইহুদি ব্যক্তির লাশ নিয়ে কিছু লোক শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল। নবীজি সা. তখন তাদের সম্মানে কিছু সময় স্থির দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুকাওকিসের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি মুকাওকিসকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করেছিলেন। চিঠিতে রাসূল সা. তাকে একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মুক্তি এবং দ্বিগুণ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নবীজি সা. সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, 'যদি মুকাওকিস আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তাকে কপ্টস, তার লোকদের পাপের দায়ভার বহন করতে হবে।' উপরে উল্লেখিত মন্তব্যের রেফারেন্স হিসাবে তিনি কুরআনের সুরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতটি উল্লেখ করেন যেখানে আল্লাহ পাক একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

উপসংহারে এসে বলা যায়, ইহুদি ও খৃষ্টানদের ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মদ সা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য যে কোনো সাধারণ দাওয়াতী কৌশল থেকে সম্পুর্ন আলাদা ছিল। আহলে কিতাব হিসেবে তিনি ইহুদি ও খৃষ্টানদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের সাথে ইসলামী বিশ্বাসের সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরেছিলেন। কুরআন যেভাবে ধর্মতাত্ত্বিক বক্তৃতা এবং সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে আহলে কিতাবদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুপারিশ করে; নবীজি সা. ঠিক এই নির্দেশনাই বাস্তবে অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। এর মাধ্যমে আহলে কিতাবদের অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়েছিল।

ইহুদি ও খৃষ্টানদের সাথে নবীজি সা. এর মিথস্ক্রিয়া ছিল সম্মান ও সহযোগিতার চেতনায় সমৃদ্ধ। এমনকী প্রতিকূল সময়েও নবীজি সা. নাজরান থেকে আগত খৃষ্টানদের সাথে উত্তম আচরণ করে সারা বিশ্বের মানুষের সামনে একটি অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। রাসূল সা. এর উন্নত আচরণ, ক্ষমা, শ্রদ্ধা এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্তগুলো মূলত ইসলামের মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে উৎসাহিত করে। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে রাসূল সা. মূলত তাওহিদের (আল্লাহর একত্ববাদ) অনুপম উদাহরণ স্থাপন করে গিয়েছেন।

লেখক : সাবেক সভাপতি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)

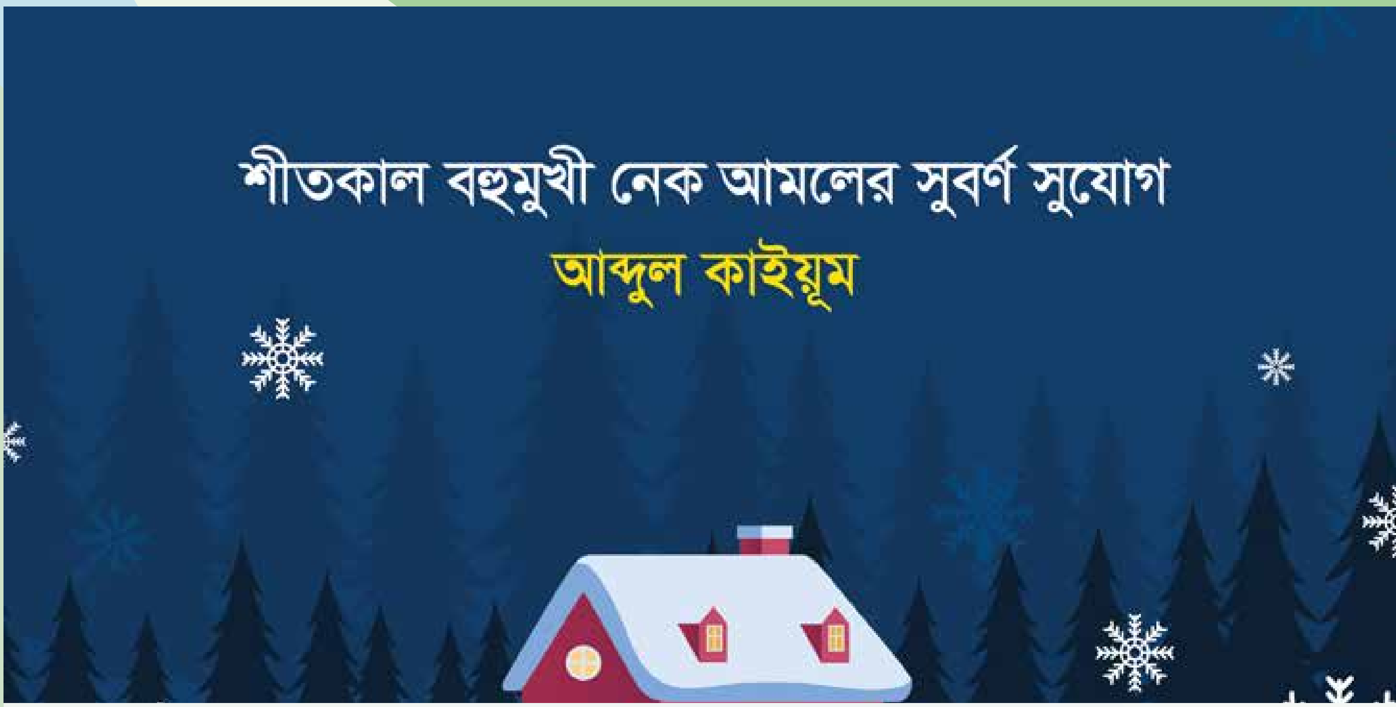

শীতকাল মুমিনের জীবনে বহুমুখী ইবাদতের এক সুবর্ণ সুযোগ। শীতকালে অনেকগুলো ইবাদত করা সহজ, যা অন্য সময়ে এত সহজে করা যায় না। তন্মধ্যে অন্যতম ইবাদত নফল রোজা যা গ্রীষ্মকালে লম্বা দিনের কারণে অনেকেই হিম্মত করতে পারে না। তাদেরকে শীতকালের এ নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন,

ألا أدلكم على الغنيمة الباردة ، قالوا : بلى، فيقول : الصيام في الشتاء

আমি কি তোমাদেরকে শীতল গনীমত সম্পর্কে আমি বলব? তারা বললেনঃ অবশ্যই। তিনি বললেন: শীতকালে নফল রোজা হচ্ছে শীতল গনিমত। (মুসনাদ আহমাদ/বায়হাকী/ মুসান্নাফ আবি শাইবা)।

কারণ: শীতকালে দিন ছোট হওয়ার কারণে নফল রোজা রাখা অনেক সহজে। আর লম্বা রাতের কারণে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা ও সহজ। যা অন্য সময়ে অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমরা সবাই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই এবং জান্নাতে যেতে চাই, কিন্তু আমাদের ইবাদত– আমলের যে দুরাবস্থা, তা দিয়ে কি করে এত বড়ো সফলতা অর্জন হতে পারে। জান্নাতের জান্যে তো অনেক উচ্চমূল্য প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن أبي هريرةرضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي: ٢٤٥ / حسن

জেনে রেখো, আল্লাহর সামগ্রী খুবই মূল্যবান। জেনে রেখো আল্লাহর সামগ্রী হচ্ছে জান্নাত। (তিরমিজি, হাসান)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل

ফিরিশতাগণ পবিত্র ও উত্তম মানের মুমিনদের মৃত্যু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে, তোমাদের নেক আমলগুলোর বিনিময়ে। (সুরা নাহল : ৩২)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগণ তাঁর জীবদ্দশায় স্বপ্ন দেখলে তাঁর কাছে এসে স্বপ্ন বর্ণনা করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তা শুনে, আল্লাহর ইচ্ছায় যা বলার তিনি তাদেরকে তা বলতেন। আমি তখনও বাল্য বয়সের। বিয়ের আগে আমি মসজিদেই থাকতাম। আমি মনে মনে নিজেকে বললাম, তোমার মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকত তা হলে অন্যরা যে ভাবে স্বপ্ন দেখে, তুমিও সে ভাবে কিছু দেখতে! একদিন রাতে ঘুমাতে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ! আমার মধ্যে যদি ভালো কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন, তাহলে আমাকে স্বপ্ন দেখান। এরপর দেখতে পেলাম, আমার কাছে দু'জন ফিরিশতা আসলেন। উভয়ের হাতে রয়েছে লোহার তৈরি হাতুড়ি, তারা দু'জনে ধরে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দু'জনের মাঝখানে থেকে আমি শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, 'হে আল্লাহ! আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর লোহার হাতুড়ি ওয়ালা আরেকজন ফিরিশতাকে দেখলাম, তিনি বললেন– ভয়

পেয়োনা; তুমি তো ভালো মানুষ! তবে আরেকটু যদি বেশি নফল সালাত আদায় করতে! তারা আমাকে ধরে নিয়ে একদম জাহান্নামের তীরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জাহান্নামকে দেখতে মনে হলো সেটা একেবারে পাকা কুয়ার মতো। কুয়ার পাশে অনেকগুলো খুঁটি গাড়ানো আছে। প্রত্যেক দু খুঁটির মধ্যখানে একজন ফিরিশতা আছেন লোহার হাতুড়ি নিয়ে। জাহান্নামের ভিতরে কিছু লোককে দেখতে পেলাম শিকল দিয়ে বাঁধা, তাদের মাথা নিচের দিকে ঝুলানো। তথায় আমি কুরাইশদের কিছু লোককে দেখে চিনে ফেললাম। ফিরিশতাগণ আমাকে ডান দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি (আমার বোন) হাফসা (রা.) কে স্বপ্ন বর্ণনা করলাম। তিনি তা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বর্ণনা করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, আব্দুল্লাহ তো নেককার মানুষ। যদি সে রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ পড়তো! ছালেম বলেন, এরপর তিনি রাতের অল্প অংশয় ঘুমাতেন। (বুখারি ও মুসলিম)

শীতকালে ক্বিয়ামুল্লাইলের পর নফল রোজার সুযোগ ও যেন আমরা হাত ছাড়া না করি। আর শীতকালে নফল রোজার আমলে অভ্যস্থ হলে গ্রীষ্মকালেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দেবেন। সারা বৎসর দু ধরনের নফল রোজার চর্চা করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। একটি হাদিসে সোম এবং বৃহস্পতিবারের রোজার গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন,

تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ : الترمذى

(বান্দার) আমল সমূহ সোমবার এবং বৃহস্পতিবার (আল্লাহর কাছে) পেশ করা হয়, সেজন্যে আমি চাই আমার আমলগুলো (আল্লাহর কাছে) এমন অবস্থায় পেশ করা হোক যে আমি তখন রোজা অবস্থায় আছি। (তিরমিজি, হাসান)

আরেকটি হাদিসে মাসের মাঝখানের তিনদিনের রোজার গুরুত্ব সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন–

أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثلاث لَنْ أَدَعهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيامِ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر، وَصَلاةِ الضحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَام حَتى أُوتِر. /مسلمٌ

আমার প্রিয় নবী (সা.) আমাকে তিনটি আমলের জন্যে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়ে গেছেন। যতদিন বেঁচে থাকব, তা কখনও ত্যাগ করব না। প্রতিমাসের (মধ্যখানের) তিন দিনের (১৩, ১৪, ১৫) রোজা, সালাতুদ্দোহা (চাশতের নামাজ) আর বিতর না পড়ে না ঘুমানো। (মুসলিম)

শীতকালের অন্যতম ইবাদাত হচ্ছে– কনকনে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গরিব দুঃখীদেরকে শীতবস্ত্র দান করা। গাজা, ফিলিস্তিন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শরণার্থীদেরকে শীত বস্ত্র, খাদ্য পানীয় চিকিৎসা ইত্যাদির জন্যে সাহায্য করা আল্লাহর কাছে অনেক বড়ো আমল হিসেবে সমাদৃত হবে। ইমাম ইব্‌ন রজব আল-হাম্বলী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত লাতাইফ আল মাআরিফ গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

মদিনার একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছাফওয়ান বিন ছুলাইম ছিলেন মদিনার অন্যতম একজন ফকিহ, আবেদ এবং মহানুভব ব্যক্তি। তিনি এক কনকনে শীতের রাতে মসজিদ আন-নাবাওয়ী থেকে বের হয়ে দেখলেন খালি গায়ে প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে একজন হত দরিদ্র মানুষ। নিজের গায়ের জামা খুলে তাকে পরতে দিয়ে নিজে খালি গায়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি চলে গেলেন। এ ঘটনার পর সিরিয়াতে এক আল্লাহর বান্দাহ স্বপ্ন দেখলেন। একজন মানুষকে গায়ের কাপড় খুলে পরতে দেওয়ার কারণে ছাফওয়ান জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তিনি মদিনায় এসে খোঁজ করলেন ছাফওয়ানকে দেখতে এবং তাকে এ স্বপ্নের কথা জানালেন। আসুন আমরা শীতের এবাদতগুলোর আমল মনোযোগ দিয়ে শুরু করি। নিম্নের হাদিসটি দিয়ে উপসংহার টানি–

عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام وصلى والناس نيام ". الترمزي: حسن

আবু মালিক আল আশআরী)রা.(বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ)সা.(বলেছেন, জান্নাতে এমন সব অট্টালিকা বা কক্ষ রয়েছে, যেগুলোর ভেতরে থেকে বাইরের সব কিছু দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সব কিছু দেখা যাবে। আল্লাহ সেগুলোকে তৈরি করে রেখেছেন ঐসব লোকদের জন্যে, যাদের কথায় বার্তায় রয়েছে ভদ্রতা ও নম্রতা, যারা ক্ষুধার্তকে খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করে, রোজার পর রোজা রাখতে থাকে, আর মানুষ যখন রাতের বেলায় ঘুমে অচেতন তখন তারা তাহাজ্জুদ আদায় করে থাকে। (তিরমিজি, হাসান)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ধরনের আমলগুলো বেশি বেশি করে করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : ইসলামিক স্কলার; ইমাম ও খতিব, ইস্ট লন্ডন মসজিদ।

কবির লাইফস্টাইল ও আদর্শিক কমিটমেন্ট

প্রফেসর ড. এ.কে.এম আব্দুল কাদের

আমি এক সময়ে মাসিক পৃথিবী, মাসিক কলম ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় কিছু লেখালেখি করতাম। এইসব লেখার জন্য কিছু সম্মানীর ব্যবস্থা থাকতো। আমি কোন উপলক্ষ্যে ঢাকা যাওয়ার সুযোগ হলে হাতে হাতে তা গ্রহণ করতাম। মাসিক পৃথিবী ও মাসিক কলমের অফিস ছিল কাঁটাবনে অবস্থিত বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে। মাসিক পৃথিবীতে আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এরপর অন্যান্য পত্রিকায় লেখা মূলত মাসিক পৃথিবী কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে। এইভাবে জনাব এ কে এম নাজির আহমদ, কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও কবি মোশাররফ হোসাইন খান প্রমুখের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর সূত্র ধরে একবার কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমাকে তাঁর উত্তরাস্থ বাসায় মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানান। উত্তরায় আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ স্যার বসবাস করতেন। এটি ১৯৯০ সালের কথা। আমি মনে মনে ভাবলাম, উত্তরা গেলে এক উসিলায় আমার স্যারের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবো। আমি চলে গেলাম। গিয়ে দেখি, কবি মতিউর রহমান মল্লিক দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি ছোট্ট ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। মাসিক ভাড়া বারশ্ত টাকা। আমন্ত্রিত অতিথির জন্য আয়োজন পোড়া মরিচ দিয়ে ডাল রান্না আর আলু ভর্তা। অনেক তালাশ করে একটা ডিম পাওয়া গেল। আমি নিষেধ করার পর সেটি আর ভাজি করা হলো না। সেদিন তিনি জীবনের অনেক গল্প করলেন। কীভাবে সুদূর বাগেরহাট থেকে ঢাকা আসলেন, কেন লেখাপড়া সম্পন্ন করতে পারলেন না। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বললেন, তিনি সস্ত্রীক ঢাকা থাকেন। একটি মাত্র মেয়ে নানুর বাড়ি থাকে। এর কারণ দুটি। একদিকে ব্যয় সাশ্রয়, অপরদিকে স্ত্রীর লেখাপড়া নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। আর আজ দুপুরে আমরা যা কিছু খেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ! এটি তাঁর প্রাত্যহিক খাবার। তিনি বললেন, ইসলামিক সেন্টার থেকে তিনি মাসিক দুই হাজার আটশত টাকা বেতন পান। এই টাকা দিয়ে পুরো মাস চলতে হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে এত কম বেতন কেন দেওয়া হয়? তিনি বললেন, দেখুন ভাই, ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঢাকা শহরে কোন ইন্টারমেডিয়েট পাশ চাকুরীজীবি কি আমার সমান বেতন পায়? এই কথা বলে তিনি এক তৃপ্তির হাসি দিলেন। কী নিষ্পাপ তাঁর চেহারা, কী তৃপ্তি তাঁর চাহনিতে, কী সাধারণ তাঁর লাইফস্টাইল, কী সাধারণ তাঁর অভিব্যক্তি, আর কী অসাধারণ তাঁর আদর্শিক কমিটমেন্ট। এটি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার কিংবা এর গভীরতা পরিমাপ করার কোন উপায় নাই।

আজ বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের ইতিহাস লিখতে গেলে কবি, গায়ক, সুরকার মতিউর রহমান মল্লিকের নাম কোন না কোনভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হবে। কিন্তু তিনি জীবনে ত্যাগের যেই নজরানা পেশ করেছেন তা আমরা কজনেই বা জানি?

লেখক : শিক্ষাবিদ; অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আচরণ

আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ

পৃথিবীর সকল ফুলের সৌরভকে হার মানিয়েছিল যে সুগন্ধি, দুষিত বাতাস পরিণত হয়েছিল সুবাতাসে।

অশান্ত পৃথিবীর শান্তি প্রিয় মানুষগুলোর মুক্তির দিশা মিলেছে যাকে পেয়ে। তিনি হলেন সাইয়েদুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামীন আমাদের আদর্শ নেতা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)। যার কোমলতা, উদারতা, স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে আরবসহ সারা দুনিয়ার কাছে পরিচিতি পেয়েছে উন্নত চরিত্র ও মহাউত্তম স্বভাবের এক মহামানব হিসাবে। যার আগমনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ সংস্কার করা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবার ৩৩ নং আয়াতে বলেন

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ

তিনিই তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।

প্রিয় পাঠক আমার আজকের বিষয় 'অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ সা. এর আচরণ'

নবুওয়াতের পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আচরণ :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবকে শুধু কুরাইশ বংশ থেকে বনি সা'দ গোত্র পর্যন্ত নয়। বরং পুরো আরবের মানুষের কাছে আল আমিন, আস সাদিক ও মানবতাবাদী হিসাবে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন বিশেষ নিরাপদ ও কালিমামুক্ত পরিবেশে এবং জাহিলিয়াতের নাপাক ও খারাপ অভ্যাসগুলো থেকে আল্লাহ তাঁকে সর্বদাই দূরে ও মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে সব ধরনের মানবিক, চারিত্রিক ও নৈতিক দুর্বলতা, স্খলন ও ত্রুটির ঊর্ধ্বে রেখেছেন। রিসালাতের পূর্বেই তিনি প্রশংসনীয় গুণাবলি, উন্নত মনোবল, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, লাজনম্র সত্যবাদী, আমানতদার হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। কটুক্তি ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ এবং গান বাজনা থেকেও দূরে ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সা. নবুয়তের পূর্বে বন্ধুবান্ধব ও অসহায় লোকদের সাথে কেমন দরদী ও মানবতাবাদী আচরণ করেছেন। তার কিঞ্চিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি–

একবার তিনি বকরি ও উট চরানোর সময় সাথীদের কাছে পশু রেখে দুই দিনের জন্য মক্কা নগরীতে রাতের আনন্দ আড্ডায় অংশ নিতে বন্ধুদের সাথে এসছিলেন। সেখানে গান-বাজনা হচ্ছিল। দুই দিনই আল্লাহ তাঁর কান বন্ধ করে দেন এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে হেফাজত করেছেন। তিনি বন্ধুদের কাউকে দোষারোপ করেননি বলেননি যে, তোমরা আমাকে এখানে এনেছ তাই আমি অসুস্থ হয়েছি। বরং তিনি অত্যন্ত নরম ভাষায় বলেছিলেন চলো আমরা আমাদের বকরি গুলো দেখাশোনার কাজে মনোযোগ দেই।

আরেকবার মক্কায় চরম দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে কোরাইশ বংশের লোকেরা বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে নবীজির চাচা আবু তালিবের কাছে আবেদন জানায়। তখন তিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে সঙ্গে নিয়ে কাবার সামনে এলেন এবং তাঁর পিঠ কাবার দেয়ালে ঠেকিয়ে দিলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। শহর-প্রান্তর সজীব, উর্বর হয়ে গেল। এতে মক্কার মানুষ বালক মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে অনেক ভাল মন্তব্য ও কাব্য বলতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি এ নিয়ে কোন ভাব বা নিজেকে উঁচুমানের কিছু মনে করেননি। বরং নবুয়তের আগেও তিনি মানুষের প্রয়োজনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

নবুয়তের আগে মহানবী (সা.) নিজের ও চাচা আবু তালিবের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য 'কয়েক কিরাতে'র (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিপরীতে পয়সার মর্যাদায় ব্যবহৃত হতো) বিনিময়ে মক্কার লোকদের পশু চরাতেন। এ ছাড়া ছোট ছোট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাবসায়িক অংশীদার আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব (রা.) মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি আমার অংশীদার ছিলেন। কতই না উত্তম অংশীদার। যে কখনো কথা ভঙ্গ করেনি এবং যে কখনো ঝগড়া করেনি।

ইসলামের আগমনের পূর্বেও তিনি অসহায়দের পক্ষে জালিমের বিপক্ষে অবস্থান করেছেন হিলফুল ফুযুল তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। মক্কায় ব্যবসা করতে আসা জুবাইদ এর মালামাল ক্রয় করেন আস বিন ওয়ায়িল সাহমী। কিন্তু আস বিন ওয়ায়িল সাহমী তাঁর প্রাপ্য তাঁকে না দিয়ে তা আটক রাখেন। এ ব্যাপারে জুবাইদ আরবের গোত্রগুলোর কাছে সহযোগিতা চেয়ে ব্যর্থ হয়। জুবাইদ ব্যথিত মন নিয়ে জাবালে আবূ কুবাইশ পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে নিজের অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিও বর্ণনা করেন। যা শুনে জুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব ও বালক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সা.) গোত্র গুলোকে একটি সন্ধিচুক্তি করেন এবং পরে আস বিন ওয়ায়িলের নিকট থেকে জুবাইরের পাওনা আদায় করে দেয়া হয়।

শুধু নিজ গোত্র বা নিজস্ব বন্ধু/সাথীদের সাথে ভাল আচরণ করেছেন এমন নয়। বরং এরকম হাজারো সদাচারণের দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, যা তিনি অসহায় মানুষের জন্য করেছেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আচরণ :

অশান্ত পৃথিবীর শান্তির দূত নবী কারীম (সা.) এর উপর রিসালাতের দায়িত্ব আশার পর। উনি আগের চাইতে আরো বেশি প্রেমময়ী, উদার ও মানবতাবাদিতার পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন। তিনি এমন এক জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন যার মাঝে বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার সব উপাদান, মাধুর্য ও উদারতা বিদ্যমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন–

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَیۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَ لَا تَكُنۡ لِّلۡخَآئِنِیۡنَ خَصِیۡمًا

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদেরকে আদেশ প্রদান কর, যা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। (সুরা নিসা : ১০৫)

তার আদর্শ থেকে আমরা যে সকল অনুপম আদর্শের শিক্ষা পাই। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথে আচরণের মাপকাঠি।

হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও হযরত কায়েস ইবনে সাদ (রা.) একদিন এক স্থানে বসা ছিলেন। তারা তখন কাদিসিয়ায় থাকেন। পাশ দিয়ে একটি লাশ নেওয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা দুজনই দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে জানাল, 'এ এক অমুসলিমের লাশ।' তারা তখন শোনালেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়েও একবার এক লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি যখন তা দেখে দাঁড়ালেন, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

أليست نفسا অর্থাৎ 'সে মানুষ ছিল তো?' (বুখারি ১৩১২)

এ বিষয়ে হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিলো। রসুলুল্লাহ (সা.) তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাকে বললাম, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! এ তো এক ইহুদির লাশ! রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে।' (বুখারি ১৩১১)চ

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরের হাদিসটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

অমুসলিমদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ও কথাবার্তা বলা বৈধ। যদি প্রয়োজন হয় মসজিদেও তারা বসতে

সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির, নানা পেশার, নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। যদি কারো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হলো তার সঙ্গেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করে চলতে হবে।

পারবে।আমরা জানি যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি রসুল সা.-এর দরবারে হাজির হয়েছে, তখন তারা মসজিদের শেষে গম্বুজের কাছে অবস্থান করে। আর যখন নামাজের সময় হলো, দলের একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রসুল, নামাজের সময় হয়েছে। এরা একদল অমুসলিম, তারা মসজিদে আছে। তখন রসুল সা. বলেন, 'অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।' (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৮৫৭৬)

কোনো অমুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে রসুল্লাহ সা. তাকে দেখতে যেতেন। অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া সুন্নত। নবী করিম সা. অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন। তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন।

হযরত আনাস রা. বলেন, এক ইহুদি দাস নবী করিম সা.-এর খেদমত করত। যখন সে অসুস্থ হলো, তখন মহানবী সা. তাকে দেখতে গেলেন, তার মাথার দিকে বসলেন আর তাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো! তখন সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী সা. এই বলে বের হলেন, আল্লাহর শোকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।' (বুখারি ১২৫৬)

কোনো অমুসলিম মৃত্যু বরণ করলে তাদের সম্পর্কে রসুল সা. বলেন, তাদের জীবিতের যেমন হক রয়েছে, তেমনি মৃতেরও হক রয়েছে। প্রয়োজনে তাদের দাফন বা সৎকারে সহযোগিতা করতে হবে। কেননা তারা শ্রেষ্ঠ মাখলুক তথা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত।

অমুসলিমদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষেধ। যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে জিম্মি হিসেবে (মুসলিম রাষ্ট্রের আইন মেনে) বসবাস করে, তাদের হত্যা করা যাবে না। তেমনি যারা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের হত্যা করা যাবে না। তাদের জানমালের নিরাপত্তা মুসলমানদের মতোই অপরিহার্য। হাদিস শরিফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়। (বুখারি ৩১৬৬)

অমুসলিমদের সহযোগিতা করার বিষয়েও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাহ হচ্ছে - যাকাত ছাড়া অন্য দান বা সাদকা করা যাবে

সদকা শব্দটি সাধারণত নফল দান-অনুদান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে যেকোনো অমুসলিমকে দান করা সব আলেমের ঐকমত্যে বৈধ। অমুসলিম প্রতিবেশী আক্রান্ত হলে,

তারা বিপদগ্রস্ত হলে মুসলমানদের উচিত তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা. বৃদ্ধ ইহুদির জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন– এটা তো তিনি শাসক হিসেবে করতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেই ইহুদিকে লক্ষ করে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের সামনে চিন্ড়ার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। যে সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও আসল চরিত্র। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি জাকাত অমুসলিমদের দেওয়া যাবে না। শুধু যাকাতের ক্ষেত্রে বিধানের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা হয়েছে, অন্যথায় যেকোনো দান-সদকা, এমনকি ফিতরাও অমুসলিমদের দেওয়া যায়।

এখানে লক্ষণীয় যে যাকাত দিতে হয় বছরে একবার। মুসলিম ধনীদের মধ্যে কারো প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কিংবা এর অর্থমূল্য পরিমাণ সম্পদ মজুদ থাকলে এবং এর ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়। এটি ধনীদের সম্পদ থেকে ২.৫ শতাংশ আদায় করতে হয়। অন্যদিকে সদকা বছরের যেকোনো সময় অনির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেওয়া যায়। তা ছাড়া সদকা ধনীরা ছাড়াও মোটামুটি সচ্ছল যে কেউ আদায় করতে পারে। সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির, নানা পেশার, নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। যদি কারো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হলো তার সঙ্গেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করে চলতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর ঘটনা। একদিন তার ঘরে একটি বকরি জবাই করা হল। খাবার রান্না হলে তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি এ খাবার দিয়েছো?' এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরাইল আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমি মনে করছিলাম, তিনি হয়ত তাদেরকে ওয়ারিশই বানিয়ে দিবেন। (তিরমিজি ১৯৪৩)

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَ اِنۡ جَاهَدٰكَ عَلٰۤی اَنۡ تُشۡرِكَ بِیۡ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡهُمَا وَ صَاحِبۡهُمَا فِی الدُّنۡیَا مَعۡرُوۡفًا ۫ وَّ اتَّبِعۡ سَبِیۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۵﴾

তোমার পিতা-মাতা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান (দলিল ও প্রমাণ) নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো। আর এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করব, যা তোমরা করতে। (সুরা লোকমান ১৫)

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) বলেন, রসুলের যুগে আমার মা আমার কাছে এলেন, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। তখন আমি রসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা এসেছেন। তিনি ইসলাম ধর্মবিমুখ (অমুসলিম)। আমি কি তার আত্মীয়তা রক্ষা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তার সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করো। (বুখারি ২৬২০)

লেখক : সভাপতি, পর্তুগাল মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

সংগঠন সংবাদ

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)-এর সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইউরোপের সর্ববৃহৎ দাওয়া সংগঠন মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) এর সদস্য সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। ১৩ অক্টোবর রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি ইভেন্ট হলে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এই সম্মেলনে শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা এরশাদ উল্লাহ। দারস পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মামুন আল আজমী। মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ এর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল মতিন চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা'র) ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন-অর-রশীদ।

তিনি বলেন তারুণ্য যেকোনো জাতির অমূল্য সম্পদ। তারুণ্যের দৃঢ় মনোবল, অপরিসীম সাহস ও কাজ করার দক্ষ মানসিকতাই পারে একটা জাতিকে চেঞ্জ করে দিতে। সভ্যতার উত্থান-পতনে তার বড় অংশই এসেছে তারুণ্যের হাত ধরে। তারা শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী। সকল পর্যায়ে তরুণদের প্রাধান্য দিতে দিবে।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মোসলেহ ফারাদী, হাবিবুর রহমান, দেলোয়ার হোসেন খান ও আতিকুর রহমান জিলু প্রমুখ।

সম্মেলনে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের গত এক বছরের রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ তাঁর বক্তব্যে এমসিএ এর সদস্যদেরকে রাসুল (সা.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সর্বোত্তম চরিত্র গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত মান উন্নয়ন, আদর্শ পরিবার গঠন এবং সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসার সর্বাত্মক আহ্বান জানান। তিনি বলেন সকলের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা নিয়ে আমাদের মিশন বাস্তবায়িত করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সন্ড়ানরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তাদের শিক্ষা এবং দুনিয়া ও পরকালের জীবনকে সফল করার জন্য, পুরো জীবনকে শিক্ষা জীবন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহর রাসুল (সা.) বলে গিয়েছেন শিক্ষা লাভ করতে হবে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। এজন্যই তিনি বলেছেন এক ঘণ্টা জ্ঞান চর্চার মর্যাদা সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে বেশি ।

সম্মেলনে লন্ডন, লুটন, বার্মিংহাম, মানচেস্টার, অউল্ডহাম, নিউকাসেল, পোউস্টমাউথ, ট্রাইটন, নরউইচ, সাউথাম্পাটন ও গ্লাসগোসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে শত শত সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল মতিন চৌধুরী

সম্মেলনে বিভিন্ন রিজিয়ন থেকে আগত সদস্যরা।

অ্যালবাম

ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস রিজিয়নের উদ্যোগে সহযোগী সদস্যদের তারবিয়াহ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এমসিএ লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট ও লন্ডন সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লন্ডন ইস্ট রিজিয়নের ইয়ুথ বিভাগের উদ্যোগে ‘ইউনিটি ইন ফেইথ’ ফ্যামিলি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লন্ডন নর্থ ইস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে ফ্যামিলি ট্রিপ অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশে বন্যা দুর্গতদের মাঝে মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) ও হিউম্যান কেয়ার ইনিশিয়েটিভের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস রিজিয়নের উদ্যোগে সদস্যদের ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং অনুষ্ঠিত।

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) এর উদ্যোগে ‘ইসলামোফোবিয়া এক্সপোজড : ইমপ্যাক্ট অন মুসলিম কমিউনিটি’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।